Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্থ বর্ষ ■ সংখ্যা ২ - জুলাই ২০১৪

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত

জিৎ বাহান মুন্ডা, রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক, ২৭শে জুন, ২০১৪
মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তোলা ছবি।
(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৮শে জুন ২০১৪)

সম্পাদকীয় ঃ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ঃ মালদহ জেলার কালিয়াচক লিচু খেয়েই কি শিশু মৃত্যু ?

■জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান■বিজ্ঞানের খবর

■চিঠিপত্র■পাঠকের কলম■সংগঠন সংবাদ

■কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা?

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান	৩
অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ঃ	মালদহ জেলার কালিয়াচক ঃ লিচু খেয়েই কি শিশুমৃত্যু?	৫
	উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত	১০
	ছন্দা গায়েন ও পর্বত অভিযান	১২
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	বিভিন্ন উদ্ভিদ একই উপাদান হতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যদ্রব্য ... কীভাবে?	১৫
	নদী অথবা হ্রদের জল মিষ্টি কিন্তু সমুদ্রের জল নোনতা কেন?	১৬
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা জমিতে কৃষি এখন বাস্তব	১৯
	মঙ্গলগ্রহে কিউরিওসিটির বর্ষপূর্তি	২০
	অদৃশ্যগতি দৃশ্যমান করে তুলতে ইউলেরিয়ান ভিডিও বৃহত্তরীকরণ হাতিয়ার	২২
	নাইট্রোজেন চিহ্নিতকরণ ঃ বেশি ফলন, কম দূষণ	২৪
	আধা কৃত্রিম জীব সৃষ্টি!	২৪
	নিউট্রন স্টার ও তার সঙ্গী হীরের টুকরো	২৪
	৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবী থেকে ১৭ গুণ ভারী কঠিন গ্রহের আবিষ্কার	২৫
	গবেষণাগারে জিন পরিবর্তিত মশা তৈরী করে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ!	২৫
	তিন পিতা-মাতার জিন পরিবর্তিত মনুষ্য ভ্রূণের জন্মদান সম্ভব	২৬
	চোখের প্রেসার এবং অন্যান্য অসুবিধা চিহ্নিতকরণ সেনসর মনিটরের সাহায্যে	২৬
	স্মার্ট গ্লাসের সাহায্যে প্রায়-অন্ধ মানুষও তুলনায় ভাল দেখতে পাবেন	২৭
	নতুন মাইক্রোওয়েভ হেলমেট শরীরে স্ট্রোক ও রক্তসঞ্চালন ধরতে পারবে	২৭
	সৈনিকদের মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য এসি হেলমেট আবিষ্কার	২৭
	কফির বর্জ্য থেকে গাড়ির তেল	৩৫
	টমেটোর রস থেকে প্রস্তুত বটিকার সাহায্যে হার্টের চিকিৎসা	৩৫
চিঠিপত্র ঃ		২৮
পাঠকের কলম ঃ	'৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের তথ্য প্রমাণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্যসৃষ্ট নয়'	২৯
কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ	সমাজের সেই গণ্যমান্যরাই কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখেন	৩২
	ত্রিপুরার নয়া বিধানসভা ভবনে ভূত তাড়াতে নারায়ন পূজা!	৩৩
	দেবদাসী বা যোগিনী প্রথা বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে	৩৪
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৬
সংগঠন সংবাদ ঃ		৩৮

সম্পাদকীয়

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবজাতি বন্যাবস্থায় তার আদি বাসভূমিতে জীবনধারণ এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীর ছিল। পরে খাদ্যের অন্বেষণে নদীর গতিপথ ও সমুদ্রের উপকূল ধরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, স্বীয় শক্তিতে নতুন নতুন খাদ্য আবিষ্কার, খাদ্য সংগ্রহ করার এবং ঘর বানাবার যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিদ্যা আয়ত্ত করে। মাটি খুঁড়ে মূল বের করা, পশু এবং মাছ শিকারের পাথুরে অস্ত্র নির্মাণ করে, তীর ধনুক নির্মাণ, আগুনের আবিষ্কার, কাঠ-বাঁশ-পাথর দিয়ে ঘর নির্মাণ, পোষাক তৈরী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ীভূমিতে বাস করা শুরু করে। নৃতত্ত্ববিদ এবং নৃকুলবিদদের অনুমান এই প্রাগৈতিহাসিক যুগ ষাট হাজার বছর ব্যাপ্ত ছিল। এই পর্যায়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পৃথক ভাষা বিকশিত হয়, চিত্র খোদাই শুরু হয় কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞান উন্মেষের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

এই জ্ঞান উন্মেষের পথে বাধা ছিল মানবগোষ্ঠীগুলির মনে তাদের গোষ্ঠীপতি বা অগ্রণীদের দ্বারা প্রোথিত এই অলৌকিক ধারণা যে মহাকাশে দৃশ্যমান জগৎ (স্বর্গলোক) মানুষের আদি বাসস্থান। এই অলৌকিক শক্তিই সবকিছুর নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তিমান। সুতরাং ঐ শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা কর্তব্য। এইভাবে কল্পিত স্বর্গলোকের কল্পিত মানুষদের দেব-দেবীরূপে পূজা করা শুরু হয়। তথাকথিত অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট করে স্বার্থ সিদ্ধ করার উপায় হিসেবে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষের মন্ত্রশক্তি রূপে ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। এইভাবেই হয়েছিল ধর্মের উদ্ভব। ধর্মের উদ্ভবের মূলে আছে প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরতা এবং এই শক্তির সামনে অসহায়তা।

লৌহযুগ তথা তথাকথিত সভ্যযুগের আবির্ভাব হয় বর্বর যুগের উর্ধ্ব স্তরে। এই যুগে আর্থিক সংকট এবং যুদ্ধ বিগ্রহর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নতি অব্যাহত থাকে। তার সাথে আসে দর্শন এবং দার্শনিক যুক্তিবাদ। প্রকৃতির বিষয়ে, ধর্মের বিষয়ে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে, নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়ে, ক্রীতদাস প্রথার বিষয়ে প্রচলিত ধারণাকে নির্বিচারে না মেনে সঠিক-বেঠিক বিচারের প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভব হয় দর্শনের। এই সঠিক-বেঠিক বিচারে যাঁরা প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁদের বলা হয় দার্শনিক। যে দার্শনিকরা প্রচলিত ধারণাগুলির উৎস অনুসন্ধান না করে শুধু সঠিক-বেঠিক নির্ণয় করার চেষ্টা করতেন তাঁদের যুক্তিবাদী বলা হয় এবং তাঁদের এই প্রয়াসকে বলা হয় যুক্তিবাদ।

দার্শনিক যুক্তিবাদের প্রসার অলৌকিক কাহিনীগুলো সম্পর্কে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করে। মহাকাশে বিচরণশীল গ্রহ-নক্ষত্র'র গতিবিধি জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হতে থাকে তাদের গতি প্রকৃতি। ধর্মের কান্ডারিরা বিপদ বুঝে দার্শনিক যুক্তিবাদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে যুক্তিবাদীদের দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু শত বাধা সত্ত্বেও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মানুষ যুক্তিবাদী দর্শনকেই অনুসরণ করতে থাকেন। ফলে যুক্তিবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একে ঠেকাবার জন্য খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে; স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে থাকে এবং অলৌকিকবাদ ও ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম প্রবর্তন করে। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ হিউগ থমাস লিখেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ক্ষেত্রে চার্চগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবাদকে কোনঠাসা করা। (অ্যান আনফিনিস্‌ড হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড)

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে এই যুক্তিবাদী দার্শনিকরা অলৌকিকবাদ ও ধর্মবাদকে চ্যালেঞ্জ করে কোনও মতবাদ প্রচার করেন নি। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়লে ধর্মের প্রতি তথা ধর্মগুরুদের প্রতি অনাস্থা জন্ম নেওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায়, মানুষের চেতনার বিকাশ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে ধর্মের সংস্কার করে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখার কৌশল অবলম্বন করে ধর্মের কান্ডারি ও রাষ্ট্র নায়করা। সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মের পরস্পর অভিযোজন (অ্যাডাপটেশন) ধর্মকে জিইয়ে রাখার জন্য শাসকশ্রেণীর কাছে অপরিহার্য ছিল। তাই দেখা যায়, যুক্তিবাদী দার্শনিকরা রাষ্ট্রনীতি, শাসননীতি, রাজার অধিকার, ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির

অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বা অসংগতি দেখিয়ে যার যার মতো সমাধান দেওয়ার ফলে রাজা-রাষ্ট্র এবং চার্চের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হলেও খ্রিস্টান ধর্মগুরুর নিরঙ্কুশ আধিপত্য খর্ব হয়ে প্রটেস্ট্যান্ট, লুথেরান ইত্যাদি শাখা তৈরী হলেও রাষ্ট্র ও ধর্মের অভিযোজন মারফৎ এবং পোপকে রাজার মর্যাদা দিয়ে ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ধর্মকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। যুক্তিবাদী দর্শন তার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রগতিশীল ভূমিকায় আর এগিয়ে যেতে পারে নি।

যুক্তির ভিত্তিতে সঠিক-বেঠিক নির্ণয়ের মধ্যে আটকে না থেকে প্রচলিত ধারণার উৎস সন্ধান এবং প্রকৃতির নিয়মগুলি জানার জন্য গবেষণার দ্বারা সঠিক-বেঠিক নির্ণয় করার প্রবৃত্তি থেকে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের উদ্ভব।

বস্তুর উৎপত্তি, অসিত্ব, বিকাশ-ক্রমিক পরিবর্তন, মৌলিক রূপান্তর ইত্যাদির কারণ, নিয়ম এবং ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানই বিজ্ঞান। অজানাকে জানার জন্য মানবজাতির অগ্রণীদের অক্লান্ত প্রয়াস এবং তাঁদের নিরন্তর গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। বিজ্ঞানের সাধকরাই সমাজের বিজ্ঞানী।

মানুষের বৈষয়িক জীবনে উৎপাদন ও উৎপাদক শক্তির বিকাশ তার বুদ্ধিগত শক্তিরও বিকাশ ঘটায়। এর ছাপ পড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মত কলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত বিজ্ঞানই ঐতিহাসিক' কারণ মানব সমাজে সামাজিক বিজ্ঞান সহ সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানষই করেছে। বৈষয়িক জীবনে উৎপাদনের পদ্ধতি সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থিত করে। আবার বৈষয়িক জীবনে বিপরীতের ঐক্য ও পরস্পর বৈরিতা যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তার ফলেই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং কলা ও বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। তাই মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে বৈষয়িক জীবনে বিপরীতের ঐক্য ও পরস্পরের বৈরী সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক জীবন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটেছে। এর ফলেই একদিকে যুক্তিবাদ ও যুক্তিবাদী দর্শনের আবির্ভাব আর অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে লিপ্ত হয়েছিলেন সমাজের অগ্রণীরা।

বিজ্ঞান শ্রেণীনিরপেক্ষ কিন্তু, বিজ্ঞান যখনই বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাস এবং শোষণমূলক অর্থনীতি ভিত্তিক শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার বিপদ সৃষ্টি করেছে তখনই শাসকশ্রেণী বিজ্ঞানের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্য উদ্ঘাটনকারী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের যেমন গ্যালিলিও, সক্রেটিস, ব্রুনোদের কারারুদ্ধ এমনকি হত্যা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। বিজ্ঞানের জাজ্বল্যমান সত্যকে অস্বীকার করতে না পেরে তারা তাকে ধর্মের মোড়কে সাজিয়ে নিয়ে ধর্মের প্রতি সাধারণের বিশ্বাসকে অটুট রাখার এবং তার মাধ্যম নিজ শ্রেণীর শাসন ক্ষমতা অটুট রাখার প্রয়াসে রত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটে পুরানো পদ্ধতির ধারক শ্রেণী এবং নতুন পদ্ধতির ধারক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষে। দাস সমাজ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তর পর্বগুলির ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারি। এর সাথে এটাও উপলব্ধি করা যায় যে নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সৃষ্টি হয় নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তর হলে নতুন পদ্ধতিকে বিকশিত করার জন্য শুরু হয় সংগ্রাম। আজকের পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভ্রূণ বিকশিত হয়ে চলেছে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী সমাজের নতুন উৎপাদন পদ্ধতিকে বিকশিত করার জন্য শুরু হয়েছে সংগ্রাম। বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির ধারক পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথে আগামী উৎপাদন পদ্ধতির ধারক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং নতুন উৎপাদন পদ্ধতির বিজয়লাভের মধ্য দিয়েই একমাত্র বর্তমান সমাজের সমস্যা ও সংকটগুলি দূর হওয়া সম্ভব। সমাজ বিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। ■

—ঃবিজ্ঞপ্তিঃ—

[illegible]

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট ঃ

মালদহ জেলার কালিয়াচক লিচু খেয়েই কি শিশু মৃত্যু ?

– নন্দা মুখার্জী

মৃত শিশু সরফরাজের মা সাজিরা বিবি
২২শে জুন, ২০১৪

"তুই লিচু এনেছিস? জানিস না লিচু খেয়ে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে?" এই বলে মা আমার হাত থেকে লিচুর প্যাকেটটা নিয়ে সোজা ডাস্টবিনে ফেলে দিল। আমায় কিছু বলার অবকাশ অবধি দিল না। সস্তায় কেনা ডাস্টবিনে গড়াগড়ি খাওয়া লিচুগুলোর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম শুধু। বিকালে বিজ্ঞান মনস্ক'র মিটিংয়ে একথা উত্থাপন করতেই সবাই সমস্বরে বলে উঠল তারাও খবরের কাগজে এখন প্রায় রোজই এবিষয় নিয়ে কিছু না কিছু লেখা পড়েছে। রাজ্যের এক মন্ত্রী তো নিজেই বলেছেন যে কাঁচা লিচু খেয়েই মালদায় শিশুরা মারা গেছে। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা ঠিক এমন কথা বলছেন না। বলছেন অজানা এক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নাকি শিশুরা মারা গেছে। অনেক কাগজে লিখেছে এনিয়ে গবেষণা চলছে কিন্তু রিপোর্ট এখনও আসেনি। বিষয়টা তবে ঠিক কী? মিটিং-এ সকলেই এ ব্যাপারে কৌতুহল প্রকাশ করল এবং সিদ্ধান্ত হল বিষয়টা সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে হবে। বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে পরিচিত যোগাযোগ বার করে গত ২১শে জুন ২০১৪ রাতে আমরা ২ কর্মী মালদার কালিয়াচকের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

পরদিন সকালে আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম কালিয়াচকে পৌঁছে গেল। কালিয়াচকে আমাদের এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু শ্রী মলয় সাহা এবিষয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন। প্রথমে আমরা কালিয়াচকের এক বড় সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী শ্রী অমল কুমার সাহা'র কাছে গেলাম। তিনি জানালেন যে লিচু উৎপাদনের সাথে যুক্ত ঐ অঞ্চলের সমস্ত চাষী তার কাছে আসেন এবং সার ও কীটনাশক কেনেন। জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গেল যে, সব চেয়ে বেশী লিচু উৎপাদনকারী অঞ্চল – চাঁদপুর, সেরসাহী, সুলতানপুর, ভজনপুর সহ কোন অঞ্চল থেকেই তিনি লিচু খাওয়ার কারণে শিশু মৃত্যুর কথা শোনেনি। যা জেনেছেন খবরের কাগজ পড়েই জেনেছেন। এসব নিতান্তই গুজব। শিশুমৃত্যু অন্য কোন্ কারণে হচ্ছে তা ডাক্তাররাই ভাল বলতে পারবেন। তবে তিনি একথা স্বীকার করলেন যে লিচুতে কীটনাশক তিনবার স্প্রে করতে হয় – যখন ফুল আসে, ফল আসে এবং লিচুতে রঙ ধরে। তবে অনেক জায়গায় চাষীরা ৩ বারের বদলে ৫-৬ বারও স্প্রে করে। যখন আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছি তখন দোকানে সার কিনতে আসা দুজন চাষী আমাদের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এলেন। তাঁরা উত্তেজিত গলায় বলতে লাগলেন "এসব গুজব। লিচু খেয়ে কোনও বাচ্চা মারা যায় নি, যেতে পারে না। অন্য কোনও কারণে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে।" পরিচয় জানতে চাইলে তাঁরা বলেন – একজন সুলতানগঞ্জের আজমল মহম্মদ শেখ এবং অন্যজন চাঁদপুরের বাসিন্দা মহম্মদ কেরামল শেখ। তারা হা হুতাশ করে বলেন "প্রচুর টাকা লোকসান হয়েছে। এই গুজব রটার পর থেকে কোনও আড়তদার আর লিচু কিনছে না। পুলিশ জোর করে লিচু ভর্তি ট্রাক আটকে লিচু মাটিতে ফেলে দিয়েছে। মহাজনদের কাছে টাকা ধার নিয়ে, বাড়ির মহিলাদের গয়না বন্ধক রেখে এই কারবার করেছিলাম। দেনার দায়ে এখন গলায় ফাঁসী দেওয়ার উপক্রম। এসবই হচ্ছে রাজনৈতিক চক্রান্ত।" শেষের কথাটা শুনে ধাক্কা খেলাম। "রাজনৈতিক চক্রান্ত"! সেটা কীভাবে? না তারা এর বেশি

মুখ খুলতে চাইলেন না। কিন্তু বার বার একই কথা বলে যেতে লাগলেন।

এরপর আমরা চাঁদপুরের এক ধনী লিচু ব্যবসায়ী রহিম শেখের বাড়ি গেলাম। তার কাছে আমরা বাগানে লিচুর ফলন থেকে তা বাজারে আসার সমগ্র বিষয়টা জানতে চাইলাম। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেন যে লিচু বাগানের মালিক অর্থাৎ গাছ ও জমির মালিককে স্থানীয় ভাষায় **গেরোস** বা **গেরোস্তো** বলে। এই গেরোস্তো সরাসরি নিজেও চাষ করতে পারে অথবা গাছের ফল অন্য চাষী-ব্যবসায়ীদের কাছে একবছর বা দুবছরের জন্য বিক্রিও করে থাকে। গাছে ফুল আসার পর চাষী-ব্যবসায়ীরা গাছ প্রতি ফলের স্বত্ব টাকার বিনিময় কিনে নেয়। তখন থেকে গাছ ও তার ফল রক্ষণা-বেক্ষণের সকল দায় ঐ চাষী-ব্যবসায়ীর। বাগানের মালিকের বছরে একবার গাছে সার দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও খরচা নাই। তাই তাদের কোনও লোকসানও নাই। চাষী-ব্যবসায়ীরা মজুরদের মাধ্যমে গাছে কীটনাশক দেওয়া, 'গাছ ভাঙানো'র (অর্থাৎ ফল পাড়া ও লিচুর বান্ডিল করা) কাজ করে। লিচু পাকলে কখনও সরাসরি আবার কখনও দালালদের মারফৎ আড়তদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাজার প্রতি লিচুর বান্ডিল বিক্রি শুরু হয়। দালালরা ৫-৭% টাকা কমিশন নেয়। এবছর চাষী-ব্যবসায়ীরা শুরুতে এক বান্ডিল ৭০০-৭৫০ টাকা দাম পেলেও গুজব রটার সাথে সাথে তার দাম নেমে আসে বান্ডিল প্রতি ২০০ টাকায়। তাতেও সব লিচু বিক্রি হয়নি। প্রচুর গাছ ভাঙাই হয়নি। প্রচুর লিচু মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বিপুল এক ক্ষতির বোঝা এখন তাদের ঘাড়ে।

এবছরের তাঁর নিজের লাভ-লোকসানের কথা রহিম শেখের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে বাগানের একটা অংশ তিনি নিজে চাষ করেছেন আর অন্য অংশের ফল চাষী-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেছেন। যে অংশে তিনি নিজে চাষ করেছেন সেখান থেকে এবার শতকরা ২৫% দামও তিনি পাননি। ফলে ক্ষতি হয়েছে। তার থেকেও বেশি ক্ষতি হয়েছে তাদের, যাদের তিনি গাছ বিক্রি করেছেন। তারা হাতে পায়ে ধরছে টাকা ফেরত দেবার জন্য। নইলে তারা নাকি গলায় ফাঁসী দেবে। তবে কোন শিশু মৃত্যুর ঘটনা তাদের এলাকায় ঘটেনি। এটা নিতান্তই এক গুজব মাত্র। আর এই পুরো ঘটনার পিছনে আছে এক গভীর 'রাজনৈতিক চক্রান্ত'।

৫২ বিঘার হত দরিদ্র শ্রমিক পরিবার

এবারও রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পেলাম না।

এরপর আমরা গ্রামের আরও অনেক চাষীর ঘরে গেলাম। প্রত্যেকের গলায় প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনলাম – 'গুজব', 'গলায় ফাঁসী' এবং 'রাজনৈতিক চক্রান্ত'। এরপর রহিম, বাচ্চু, আকমল প্রভৃতি কৃষি শ্রমিকদের কাছে গিয়ে তাদের কথা জানতে চাইলে তারাও বলেন যে তারাও বিরাট আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়েছেন। বছরের অন্যান্য সময় শহরে রিক্সা চালিয়ে, মুটেগিরি করে, ভিন্ শহরের কারখানায় কাজ করে কোন রকমে সংসার চালান। লিচু ফলনের সময় তারা গ্রামে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন বাগানের কাজ করেন। এবার যেহেতু প্রচুর গাছ ভাঙাই হয়নি তাই তারাও কাজ পাননি। এমনিতে তারা বাগানে ২০০-২৫০ টাকা রোজে কাজ করেন এবং প্রচুর লিচু বাড়ি নিয়ে যান। এবার কিছুই হয়নি।

এরপর আমরা কালিয়াচক থানার আইসি-র সঙ্গে দেখা করলাম। মৃত শিশুদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে শিশু মৃত্যুর কথা তিনি জানেন। এবিষয়ে তাঁর কাছে খবর আছে তবে লিচু খেয়েই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপার। লিচু ভর্তি ট্রাক পুলিশ আটকে দিয়েছে এবং লিচু বাইরে যেতে দেয়নি গ্রামবাসীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন – "না এরকম কোনও ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটেনি।" মৃত শিশুদের বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাদের খোঁজখবর করতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।

অল্প সময়ে কাজ সারার জন্য আমরা একটি গাড়ি ভাড়া করে সম্প্রতি শিশুমৃত্যু হয়েছে এমন গ্রাম ৫২ বিঘা-র দিকে রওনা দিলাম।

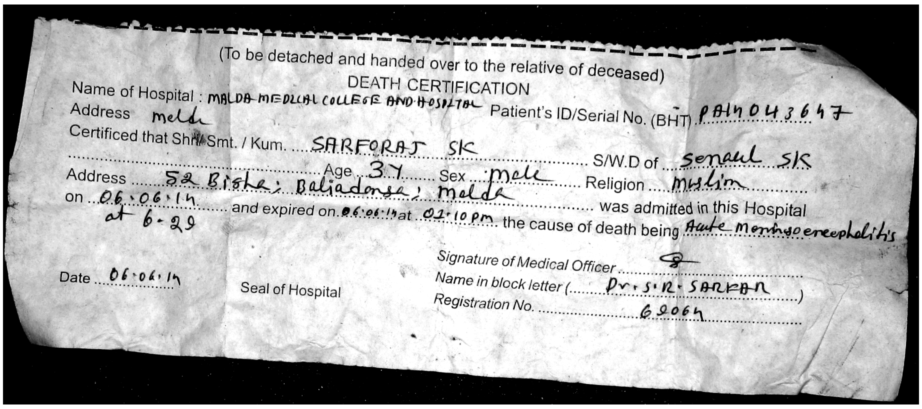

(To be detached and handed over to the relative of deceased)

DEATH CERTIFICATION

Name of Hospital : MALDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL Patient's ID/Serial No. (BHT) PAH 043647

Address malda

Certificed that Shri/Smt. / Kum. SARFORAJ SK S/W.D of Senaul SK

Age 3Y Sex male Religion muslim

Address 52 Bigha; Baliadanga; malda

on 06.06.14 at 6-29 and expired on 06.06.14 at 01:10 PM was admitted in this Hospital the cause of death being Acute Meningoencephalitis

Date 06.06.14

Seal of Hospital

Signature of Medical Officer

Name in block letter (Dr. S.R. SARKAR)

Registration No. 69064

সরফরাজের ডেথ সার্টিফিকেট

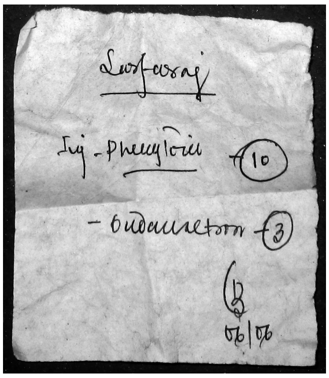

Sarfaraj

Inj - Phenytoin (10)

- Ondansetron (3)

06/06

হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন

ঝিরিঝিরি একটানা বৃষ্টি সকাল থেকে পড়েই যাচ্ছে। ৫২ বিঘা গ্রামে ঢোকার আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, কারণ প্রচন্ড কাদায় গাড়ির চাকা আটকে যাচ্ছে। অগত্যা হাঁটা ছাড়া উপায় থাকল না। জুতো বগলদাবা করে খালিপায়ে সেই কাদার রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। কাদায় পা ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। পা তুলতে তুলতে ভাবলাম – প্রগতি, উন্নয়ন কত কথাই তো শোনা যায়। আর শহর থেকে দূরে এই গ্রামগুলোয় পাকা রাস্তাটুকুও নেই। সরু সরু গলির মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে টালি আর বাঁশের বাড়ি। অনেক বাড়িতেই বিদ্যুৎ নেই। যেসব ঘরেও আছে সেখানে লো ভোল্টেজের জন্য টিমটিম করে জ্বলে। শৌচাগারের অবস্থা বিস্তারিত না বলাই ভাল, গা ঘিনঘিন করবে। গ্রামে একটাই জুনিয়র মাদ্রাসা। উচ্চ বিদ্যালয় কালিয়াচকে। সব দেখে মনে হল এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ সুস্থ আছে কীভাবে! শিশুমৃত্যুর ঘটনা অথবা বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাগুলো প্রায় সবই ঘটেছে এই হতদরিদ্র কৃষক বা দিনমজুর পরিবারগুলোয়।

আমরা গেলাম সরফরাজের বাড়িতে। গিয়ে পৌঁছাতেই বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের সাথে ৮-৯ মাসের বাচ্চা কোলে ২০-২১ বছরের সাজিরা বিবি এগিয়ে এলেন। জানালেন তিনি সরফরাজের মা। কোলের শিশুটিকে বুকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে তিনি বলতে লাগলেন তাঁর সাড়ে তিন বছরের মৃত সন্তান সরফরাজের কথা। ৫ই জুন ২০১৪, সকাল থেকেই সরফরাজের বমি, পায়খানা শুরু হয়। আগের দিন রাতে সে লিচু আর কেক খেয়েছিল। বেলা বাড়তেই খিচুঁনি শুরু হয়। তখন তারা বাচ্চাকে ব্লক প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে নিয়ে যান। হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবু একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে তক্ষুণি বাচ্চাকে মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে বলেন। কালক্ষেপ না করে সরফরাজকে সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে বেশ কিছুক্ষণ বাচ্চাটি বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকে। একজন ডাক্তারবাবুকে ছেলের

চিকিৎসার কথা বললে ডাক্তারবাবুটি জানান যে তিনি নন, যে ডাক্তারের অধীনে তার বাচ্চা ভর্তি হয়েছে তিনিই চিকিৎসা করবেন। পরের দিন সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু রোগী পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিলে তারা একছুটে তা দোকান থেকে আনতে যান। দোকানের ভীড় ঠেলে যখন ওষুধ আনা হল তখন তা প্রয়োগ করার আগেই বার বার খিঁচুনি দিতে দিতে, দুবার মা বলে ডেকে তাদের ছোট্ট সরফরাজ চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বলতে বলতে সাজিরা বিবি'র দুগাল বেয়ে বাঁধ না মানা অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। এরপর আর তাকে প্রশ্ন ক'রে বিব্রত করতে মন চাইছিল না। ওঁকে নীরব সমবেদনা জানিয়ে ফিরে আসার মুখে হঠাৎ সাজিরা বিবি আমায় ডেকে বলল "দিদি জানেন, বাড়ি শুদ্ধু, গ্রাম শুদ্ধু সবাই লিচু খেয়েছে, শুধু আমার কোলটাই ... "। প্রশ্ন ক'রে আরও জানতে পারলাম হাসপাতাল থেকে সরফরাজের দেহ গ্রামে আনার জন্য ঘটি-বাটি বিক্রি ক'রে ১৬০০ টাকা গাড়ি ভাড়া দিতে হয়েছে। আসার সময় শিশুটির ডেথ সার্টিফিকেট দেখতে চাইলাম। দেখেই চমকে উঠলাম – একি! মৃত্যুর কারণ হিসাবে তো পরিষ্কার **'এনসেফালাইটিস'**-এর কথা লেখা রয়েছে। তবে যে প্রচার হচ্ছে লিচু ঘটিত ভাইরাসে মৃত্যু! তবে যে ঘোষণা হয়েছে অজানা ভাইরাস ঘটিত রোগে শিশু মৃত্যু! তাহলে বিষয়টা কী?

শিশুটির পরিবারের লোকেদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বা অন্য কোনও সরকারী লোক মৃতুর কারণ কিছু জানিয়েছে কী? তাঁরা এর উত্তরে জানান – না, এবিষয়ে তারা কিছু জানেন না। তবে শিশুটি মারা যাওয়ার ২দিন পর থেকে দফায় দফায় বিভিন্ন ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের দল ৩-৪ বার তাদের ঘরে এসেছিল এবং তখনই তাদের জানানো হয় লিচু খেয়েই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গ্রামের অন্যান্য লোকেদের সাথে কথাবার্তায় জানা যায় যে আরও তিনজন শিশু এই অঞ্চলে একইভাবে মারা গেছে। গ্রামের সকলেই লিচু খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পোলিও কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে লিচু খেতে নিষেধ করে দিয়েছে। এই খবরটি নিয়ে এক সংশ্লিষ্ট 'পোলিও কর্মী'কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, একথা সত্য যে তাদের এই কথা বলতে বলা হয়েছে। কিন্তু কে এই নির্দেশ দিয়েছেন জানতে চাওয়ায় উনি ভয়ে আর কিছুতেই মুখ খুললেন না।

এরপর ব্লক প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। উনি তখন না থাকায় সাক্ষাৎ হল না। পরে টেলিফোনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি ডাক্তারবাবুর সাথে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নিলাম। উনি নিজে বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত বলে মন্তব্য করলেন। ওনার সাথে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে যা কথা হল তা নিম্নরূপ ঃ

প্রশ্ন ঃ কোন অঞ্চলে এই অসুখ ছড়িয়েছে? লিচু খেয়ে নাকি এই অসুখ?

উত্তর ঃ আলিপুর ২, সেরগাছি, ৫২ বিঘা, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। অসুখের লক্ষণ খিঁচুনি, জ্বর, বমি বমি ভাব। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র। কিছুটা আন্দাজ, কিছুটা গুজব এসবের উপর আমরা চলি না।

প্রশ্ন ঃ অসুখটা কি?

উত্তর ঃ নমুনাগুলো পরীক্ষা করেই বলা যাবে সঠিক রোগটা কী? এখনও অসুখের কারণটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু অসুখটা আমাদের জানা – **এনসেফ্যালোপ্যাথি**। অসুখটা যখন পরিষ্কারভাবে আবিষ্কার হবে তখন একে **এনসেফালাইটিস** বলব।

প্রশ্ন ঃ এবছর কবে থেকে এই অসুখে আক্রান্তরা আসছে। বাচ্চাদের বয়স কত?

উত্তর ঃ ৫ই জুন থেকে পেশেন্টরা আসছে। বয়স ৩ থেকে ৮ বছর। সিলামপুর থেকে ৩০ জনের মত বাচ্চা চিকিৎসার জন্য এসেছে।

প্রশ্ন ঃ কতজন শিশু মারা গেছে?

উত্তর ঃ প্রথম দিন ৭-৮ জন মারা যায়। পরে আরও ৫-৬ জন। মোট ১২-১৩ জন।

প্রশ্ন ঃ এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেছে? কোন সময়কালে?

উত্তর ঃ ২০১২ সালে একই সিজনে, একই সময় ৩০-৩৫ জন বাচ্চা মারা গেছে। এটা যদিও আমার শোনা কথা। আমি তখন ব্লকে ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ রুগীরা প্রধানতঃ কোন্ ধরণের পরিবার থেকে আসছে?

উত্তর ঃ যত পেশেন্ট এসেছে ১ জন বাদে সকলেই নিম্নবিত্ত পরিবারের। সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার পর অপুষ্টির জন্য রোগ প্রতিরোধ করতে না পারায় এত শিশু মারা গেছে।

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারদের তরফ থেকে লিচু খেয়ে এই রোগে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে কি? না হলে এই গুজব ছড়ালো কেন?

উত্তর ঃ **ডক্টরদের তরফ থেকে লিচু খেয়ে এই রোগ হয়েছে এরকম কোনও স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়নি। এটা অনেকটা গণেশের দুধ খাওয়ার মত সর্বব্যাপী প্রচার।**

প্রশ্ন ঃ গুজবটা ছড়ালো কে বা কারা? হাসপাতালের ভূমিকা কী?

উত্তর ঃ গুজব ছড়ানোর ক্ষেত্রে হাসপাতালের কোনও ভূমিকা নেই এটা বলতে পারি।

প্রশ্ন ঃ বিহারের মুজাফ্ফরপুরেও লিচু চাষ হয়, আবার এখানেও হয়। দুজায়গাতেই তো প্রায় প্রতিবছর শিশুমৃত্যু হচ্ছে। এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন?

উত্তর ঃ বিহারের মুজাফ্ফরপুরের সঙ্গে মালদার সম্পর্ক অনেকটা দর্শনের একটা বিষয় থাকে লজিক বলে তার মত। রবীন্দ্রনাথের দাড়ি আবার রামছাগলের দাড়ি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ...। মুজফ্ফরপুরে লিচু চাষ হয় আবার এখানেও হয়। দুজায়গাতেই শিশুমৃত্যু হয়েছে। সুতরাং লিচু খেয়েই শিশুমৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞান মনস্কতার দৃষ্টিতে এই যুক্তি সঠিক কি? তবে তো এরপর থেকে সারা দেশ জুড়ে যে যে অঞ্চলে কোন রোগ ছড়াবে সেই সেই অঞ্চলের উৎপাদিত ফলের মিল দেখিয়ে বলা হবে এই রোগ ওই ফল খেয়ে হয়েছে। এটা কি বিজ্ঞান সম্মত? কোনও পরীক্ষা ছাড়া কোনও স্টেটমেন্ট দেওয়া সঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সঠিক তথ্য এবং বিজ্ঞান সম্মত বক্তব্য রাখার জন্য।

'এনসেফালাইটিস' রোগটা আমাদের ভাবাচ্ছে। মালদা জেলায় তো প্রায় প্রতি বছরই গরমের শেষ দিকে প্রচুর শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। প্রথম প্রথম অজানা রোগ বলা হলেও পরে এনসেফালাইটিস বলা হয়েছে। মারা যাচ্ছে দরিদ্র পরিবারের শিশুরা। এর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। শুধু মালদহ নয় উত্তরবঙ্গের অনেক জেলায় এমন ঘটনা অতীতে ঘটেছে। অতি সম্প্রতি জুলাই ২০১৪-এর ২১তারিখ পর্যন্ত ৬৫ জন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনসেফেলাইটিসে মারা গেছেন এবং এই বছর এই রোগে মৃত্যুর হয়েছে ১৩৫ জনের। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে ২০১৩ সালে ৩৫০ জন শিশু মারা গেছে এই রোগে। বিহারের মুজফ্ফরপুরে গত দুই দশক ধরে লাগাতার শিশুমৃত্যু ঘটছে এই রোগে। এবছর মুজফ্ফরপুরে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১০৭ জন শিশু এই রোগে মারা গেছে। মুজফ্ফরপুরের ব্লক ব্লকে অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে – "a serious measures to takle encephalities including a bigger effort to identify the cause of disease & a 5 year plan similar to the one implemented for polio...."

এতসব জানা সত্ত্বেও সরকারিভাবে এই গুজব ছড়ানো হল কেন? দু-একটি পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল ছাড়া সকলেই লিচু খেয়ে শিশুমৃত্যুর কথা প্রচার করেছে। কারও মনে হল না যে সারা দেশ এমনকি বিদেশের কত লোক এই লিচু খেল কারও কিছু হল না অথচ কালিয়াচকের বাচ্চাগুলোই লিচু খেয়ে মরল? বারুইপুরেও তো লিচু হয় প্রচুর। কই সেখানে তো এমন রিপোর্ট নেই?

এনসেফালাইটিস একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। মশা বাহক হিসাবে এই অসুখ ছড়ায়। এটি এখন দুরারোগ্য নয়। রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা সারানো যায়। হতদরিদ্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরাই বারে বারে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এই সত্যটা সামনে আসলে শাসকদের সমস্যা বাড়বে তাই গুজব ছড়াও। আর এই গুজবে চাষী-ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকরা যে মার খেল তার ক্ষতিপূরণ দেবে কে?

শিশু মৃত্যু ঘটা, গুজবে এলাকার অর্থনীতিতে ভাল ক্ষতি হওয়ার পর সরকারি পরীক্ষাগার থেকে বলা হয় লিচু, তার খোসা, পাতা সব পরীক্ষা করে কোনও জীবাণু পাওয়া যায় নি যা শিশুমৃত্যুর কারণ হতে পারে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তাররা এই গুজব উড়িয়ে দিলেন।

বার বার সরফরাজের মত সাড়ে তিন বছরের মৃত শিশুর মায়ের কোল খালি হচ্ছে নানা সংক্রমণে। সংক্রমণের জন্য উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখলে এবং সংক্রামিত হচ্ছে যারা সেই হতদরিদ্র হাড্ডিসার শিশুগুলি যদি দুবেলা পেট ভরে খেতে না পায়, পুষ্টি না পায় তবে ভবিষ্যতেও বারে বারে এই ঘটনা ঘটবে। তাই সরফরাজদের মত শিশুদের মৃত্যুর জন্য দায়ী এই সমাজ ব্যবস্থা। সমাজের অতি গভীরে যে ক্ষত হয়ে আছে কোনও অ্যান্টি বায়োটিকে তা সারবে না। সমাজের খোল নলচে বদলের কথা ভাবা ছাড়া পথ নেই। আর যারা জেনেশুনে গুজব ছড়ালো, গুজব ছড়াচ্ছে তাদের কি ক্ষমা করা যায়? এদের কি শাস্তি হওয়া উচিত তা ঠিক করবেন আক্রান্ত মানুষেরা। ■

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত শাসকেরা অনাহার আর অপুষ্টির বিতর্কে ব্যস্ত

গত ৩ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে বন্ধ চা-বাগানগুলিতে ১২১ জন শ্রমিক স্রেফ খেতে না পেয়ে মারা গেছেন। ডুয়ার্সের ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি, রেড ব্যাঙ্ক, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর এবং রায়পুর চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে দীর্ঘকাল। গত ৩ বছরে ঢেকলাপাড়া বাগানে মারা গেছেন ৪০ জন। সুরেন্দ্রনগর এবং ধরণীপুর বাগানে ৩৭ জন। রায়পুর চা বাগানে ২৮ জন এবং রেড ব্যাঙ্ক বাগানে ১৬ জন। জুন মাসে কেবল রায়পুর চা বাগানেই মারা গেছেন ২টি শিশু সহ ৭ জন। এঁরা হলেন সোরাপান তিরকে (৬০), বাসু ওরাঁও (৫০), তেতরি বড়াইক (৩৫), মান্ডি মুন্ডা (৫২) এবং জিৎ বাহান মুন্ডা (৩৬) এবং দুটি সদ্যোজাত শিশু। আর জুলাই মাসে অপর একজন রেডব্যাঙ্ক চা বাগানে।

খবরগুলি সাম্প্রতিককালে সংবাদের শিরোনামে আসায় রাজনৈতিক মহলে হইচই বেধে গেছে। বিরোধীরা অনাহারে মৃত্যুর জন্য রাজ্যের শাসকদের দিকে আঙুল তুলছে আর শাসকরা বলছে মৃত্যু অনাহারে নয় অপুষ্টিতে এবং যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে। এই কাজিয়া নতুন নয়। উড়িষ্যার কালাহান্ডি, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের আমলাসোল কিংবা ডুয়ার্সের বন্ধ চা বাগানে এইরকম মৃত্যু অতীতেও হয়েছে, খবরের শিরোনামে আসেনি এমন জায়গাতেও ঘটছে আর বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে ভবিষ্যতেও ঘটবে। তখনও বিরোধীরা বলেছিল এই মৃত্যু অনাহারে আর শাসকরা বলেছিল অপুষ্টি বা সংক্রমণজনিত কারণে। পরিস্থিতির বদল হয়নি – ছিবড়ে হয়ে যাওয়া হাড্ডিসার দেহগুলি শুধু একের পর এক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

জলপাইগুড়ি শহরের অদূরে বন্ধ রায়পুর চা বাগান এখন সংবাদের শিরোনামে। এই বাগানটি বিগত ১২ বছরে পাঁচবার বন্ধ হয়েছে। ২০০২, ২০০৪ সালে কয়েকমাস বন্ধ থাকার পর ২০০৫ থেকে ২০১০ টানা ৫ বছর বন্ধ ছিল এই বাগান। ২০১০-এ শেষবার খোলার পর ২০১৩-এর অক্টোবরের পর আর সেখানে উৎপাদন চালু হয়নি। পে-রোল অনুসারে বাগানে কাজ করেন ৬১৭ জন শ্রমিক আর পরিবার পরিজন নিয়ে এই বাগানে থাকেন প্রায় ৩৫০০ জন শ্রমজীবী মানুষ।

২৭শে জুন রায়পুর টি এস্টেটে অনাহারে মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা হাজির হন ওই বাগানের 'অভিশপ্ত গুদাম লাইনে'। এই লাইন অর্থাৎ শ্রমিক বস্তিতে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৮ জন শ্রমিক মারা গেছেন। সাংবাদিকরা সেখানে পৌঁছে হাড্ডিসার মৃতপ্রায় জিৎ বাহান মুন্ডার ছবি তোলেন। এই ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুখী, উন্নত এবং আগামী দিনে সুপার পাওয়ার হতে চলা ভারতবর্ষের এই কঙ্কালসার ছবি বিশ্বজুড়ে হৈচৈ ফেলে দেয়।

বিরাট হৈচৈ হওয়ায় জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার এসডিও শ্রীমতী সীমা হালদার তড়িঘড়ি বাগান পরিদর্শন করে এসে সাংবাদিকদের জানান – এখানে অনাহারে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি। এই বাগানে অপুষ্টিজনিত কোনও সমস্যাই নাকি নেই। জলপাইগুড়ির স্বাস্থ্যদফতরের প্রধান অফিসার আরও সাবধানী হয়ে বলেন "মৃত্যুর অডিট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা যাবে না।"

এই মৃত্যু নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় গোলমালের মধ্যে পুরানো রীতি মেনে মন্ত্রী অনাহারে মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন "এখানে অনাহারে মৃত্যুর কথাই ওঠে না কারণ সরকার তো রেশনে চাল দিচ্ছে। মৃত্যু অপুষ্টির কারণে হতে পারে। তাছাড়া জিৎ বাহান তো মারা গেছে যক্ষ্মা রোগে।"

এই বক্তব্য নতুন নয়। বন্ধ কলকারখানা-চা বাগান-খনি, জঙ্গলমহল বা কৃষি ক্ষেত্রে কাজ না থাকার কারণে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। সাবেক ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা গেলেও বিদেশী বা রঙ-বেরঙের দেশী কোনও সরকারই তা স্বীকার করেনি। আজকের মন্ত্রীদের ভাষায় আগেকার মন্ত্রীরাও বলেছেন এ মৃত্যু অনাহারে নয় অপুষ্টিতে বা কোনও সংক্রামক রোগে।

এখন প্রশ্ন হল মৃত্যুর কারণ যদি অপুষ্টিই হয় তবে অপুষ্টি কেন? অপুষ্টি কি পেট ভরে খাদ্য খেলে দেখা দেয়? পুষ্টির জন্য কি মাটন, চিকেন, বিরিয়ানি খাওয়ার দরকার পড়ে? পেট ভরে ডাল-ভাত/রুটি-সব্জী খেলেও মানুষ কি

সাধারণভাবে মরে যায়? এই মানুষগুলো দীর্ঘদিন কর্মহীন। ২-৩ টাকা কেজি দরে রেশনের চাল-গম কেনার পয়সাও এদের ছিল না বা নেই। খালি পেটে না থেকে এরা কি খেয়েছিল? খেয়েছিল এবং খেয়ে চলেছে বন্য লতা-পাতা, ঘাসের বিচি, জঙ্গলের ফল-মূল, কচু-ঘেচু। এই খাদ্য বন্য জন্তুর মত জুটিয়ে নিয়ে তারা পেটের জ্বালা মিটিয়েছে। সভ্য সমাজে এইভাবে পেট ভরানোকে কি অনাহার বলবেন না?

মন্ত্রী বলেছেন কঙ্কালের মত চেহারার হাড্ডিসার জিৎ বাহান মুন্ডা অনাহারে মরে নি যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মন্ত্রী-আমলাদের কি জানা নেই যে আজকের দিনে খাদ্য আর ওষুধ পেলে কেউ যক্ষ্মা রোগে মরে না। জিৎ বাহান মুন্ডা বা অন্যদের যক্ষ্মা রোগ হল কেন এ প্রশ্নের তারা কি উত্তর দেবেন? তাছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে দেশে তো যক্ষ্মা রোগ নিরাময় প্রকল্প (আরএনটিসিপি) চালু আছে। প্রতিদিন টিভি'র পর্দায়, রেডিও এবং খবরের কাগজে এর বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। দেশের সমস্ত যক্ষ্মা রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা তো প্রতি মুহূর্তে করে চলেছে সরকার। তবে কি চা বাগান এলাকায় এই প্রকল্প চালু নেই? এই বন্ধ চা বাগানের মানুষগুলো কি দেশের নাগরিক নয়? সরকারি বিজ্ঞাপনে তো জোরে সোরে ঘোষণা হচ্ছে এই প্রকল্প দেশের সর্বত্র লাগু হচ্ছে। তবে কি জনগণের পয়সায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রচারিত ঐ বিজ্ঞাপনগুলি সত্য নয়? তবে কি প্রতারণা করা হচ্ছে দেশবাসীর সঙ্গে?

সংবাদসংস্থার প্রতিনিধিরা রায়পুর টি এস্টেটে গেলে মৃত জিৎ বাহান মুন্ডার বাবা ফগু মুন্ডা টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র (৩০.৩.১৪) সাংবাদিকদের বলেন **"এখানে মৃত্যু আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। একমাস আগে আমি আমার স্ত্রী মান্ডি মুন্ডাকে হারাই। দুদিন আগে আমার ছেলে (জিৎ বাহান) মরে গেছে। গতকাল আমরা আমাদের গৃহবধূ দিপালীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি, তার রক্তের পরীক্ষার জন্য। আজ আমার নাতি নন্দও হাসপাতালে গেছে রক্ত পরীক্ষার জন্য। ওর খুব জ্বর।"**

স্থানীয় স্কুলে সেক্রেটারি রণজিৎ লোহার টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকাকে একই দিনে বলেন "এম জি এন আর ই জি এ বা ১০০ দিনের কাজ এখানে অনিশ্চিত। আমরা মাঝে মধ্যে ১০ দিনের কাজ পাই কিন্তু সেই টাকা ২ মাস পরে ব্যাঙ্কে জমা হয়। আমি গত মাসে ১০ দিন কাজ করেছি কিন্তু এই টাকা পূজার আগে পাব কিনা জানি না। আমরা গতকাল বিশেষ সাধারণ রেশনের টোকেন পেয়েছি। এটা ২ মাস পরে মিলল। এই টোকেনে আমরা ১২ কেজি চাল পাব। আমাদের খাবার কেনার পয়সা নেই। আমরা এই রেশনের চালের জন্য অপেক্ষা করি আর বাগান থেকে শাকপাতা সংগ্রহ করি। এখানে পর্যাপ্ত পানীয় জলও নাই।"

আজ থেকে বহুদিন আগে ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গ এবং অসম রাজ্যে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার জন্য আজকের চা বাগানগুলির অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল। তখন এইসব বাগানে চা উৎপাদনের জন্য সুদূর ছোটনাগপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর থেকে উৎপাদনের উপায়-উপকরণহীন এইসব সর্বহারা মানুষরা বংশপরম্পরায় এখানে চা উৎপাদন করে চলেছেন। সৃষ্টি করে চলেছেন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এবং সর্বাধিক চা। যা থেকে প্রতিবছর মুনাফা হয় কোটি কোটি টাকা। তাঁরা দৈনিক ১৫০ টাকারও কম বেতনে কাজ করে চলেছেন। এদের ঘরে এখনও উন্নত শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছোঁয়া লাগেনি এঁদের জীবনে। এঁদের জীবন আজও আদিম আধা বন্য মানুষের মত। মুনাফার হার কমে গেলে মালিকরা বাগান বন্ধ করে দেয়। একাধিক বাগানের মালিক কোম্পানিগুলি বাজারের চাহিদা অনুসারে কিছু বাগান খুলে রেখে বাকিগুলি বন্ধ করে দেয়। কাজের উৎস বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রমজীবীরা অসহায় হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া ১০০ দিনের প্রকল্প এঁদের কাছে আকাশের চাঁদ পাওয়ার সামিল হয় তখন। যদিও কাজ করে মজুরি মেলে কয়েকমাস গেলে। বাগান খোলা থাকার সময়ই এরা আধপেটা খায় আর বন্ধ হলে চলে অরন্ধন। হাতের কাছে অন্য কাজও প্রায় মেলে না। পাথর ভাঙা, রাস্তা তৈরী, বাবুর বাড়ি কাজ কারও ভাগ্যে মেলে আর অন্যরা উপোস করে থাকে, থুড়ি বন্য লতাপাতা চিবিয়ে বা সেদ্ধ করে খায়। তারপর একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপরেও এদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক, অপুষ্টিজনিত বা যক্ষ্মা রোগে হয়েছে অনাহারে নয় বলেন যারা তাঁদের কি বলবেন? ■

ছন্দা গায়েন এবং পর্বত অভিযান

পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওয়েস্ট পিক বা ইয়াংলু কাঙে উঠতে গিয়ে গত ২০শে মে ২০১৪ পর্বত অভিযাত্রী ছন্দা গায়েন (৩৫) এবং তার দুই সহযোগী শেরপা দেওয়া ওয়াংচু (২৮) এবং মিংঘা পেম্বা (২৪) প্রবল তুষার ধ্বস বা অ্যাভালাঞ্চের মুখে পড়ে পা পিছলে খাদে পড়ে যান। ঐ সময় ছন্দার তৃতীয় সহযোগী তাশি শেরপাও সঙ্গে ছিলেন। কোনক্রমে তিনি রক্ষা পান। ছন্দা এবং তার দুই সহযোগীকে মৃত্যু খাদে পড়ে যেতে দেখেও কিছু করতে না পেরে নীচের বেস ক্যাম্পে ফিরে আসেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে নীচে নেমে আসা বাকী অভিযাত্রীরা তখন ওই বেস ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিলেন। তাশি তাদের খবর দেন এবং সকলে ফিরে আসেন।

খবর জানার পর ভারত ও নেপাল সরকারের উদ্ধারকারীদল নিখোঁজ ছন্দা ও তার দুই সহযোগীর খোঁজ করে। ওই ভয়াবহ মৃত্যু উপত্যকায় ওঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি। এরপর নেপাল সরকার সাধারণ নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ৩ দিন অবধি কারও খোঁজ না মিললে অভিযাত্রীরা দুর্ঘটনায় মৃত ধরে নিয়ে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে দেয় এবং আত্মীয়দের হাতে ডেথ সার্টিফিকেটও তুলে দেয়। এই ঘটনা ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের খবরের কাগজে নানা বিতর্ক তুলে ধরে খবর বেচার চেষ্টা করে। মুখ্যমন্ত্রী ছন্দার মাকে সস্তা প্রতিশ্রুতি দেন খুঁজে বার করার জন্য। মৃত্যু নিয়ে নানা রহস্য কাহিনী প্রচার করা হয় কিন্তু সামান্য রোজগারের জন্য ছন্দার দুই সহযোগীর মৃত্যু নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা কেউ তোলে নি।

পরিবারের উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ছন্দা আর পাঁচটা মেয়ের মত না হয়ে অল্প বয়স থেকেই সাঁতার, কাবাডি, মার্শাল আর্ট এবং পর্বত অভিযানে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৯৯৮ সালে সে ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন সংস্থায় রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং-এ নেয়। ২০০৬ সালে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পাহাড়ে চড়ার বেসিক ট্রেনিং নিয়ে এনসিসি ক্যাডেট হিসেবে পরের বছর অল ইন্ডিয়া সিকিম ট্রেকে অংশ নেয় এবং মাউন্ট ফ্লুটেড শৃঙ্গে আরোহণ করে। ২০০৮ সালে একই দিকে মাউন্ট যোগিন-১ এবং মাউন্ট যোগিন-৩-এ আরোহণ করে হাওড়ার মেয়ে ছন্দা গায়েন। এর আগে কোনও মহিলা এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বন্ধুরা এগিয়ে আসায় এবং একের পর এক বাধা অতিক্রম করার নেশা পেয়ে বসে ছন্দার জীবনে। ২০০৯ সালে মাউন্ট গঙ্গোত্রী এবং ২০১১ সালে মাউন্ট ম্যানিরাংঙ্গ বিজয় ছন্দাকে আরও সাহসী আরও উদ্যমী করে তোলে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। ছন্দা তার প্রস্তুতি শুরু করেন। বিভিন্ন অভিযানের অভিজ্ঞতা, পর্বত অভিযানের নানাপ্রকার শিক্ষা ছিল প্রধান ভরসা। কিন্তু অভিযানের খরচ কিভাবে জোগার হবে? বিভিন্ন ক্লাবগুলির সহযোগিতা যথেষ্ট নয় তাই বিক্রি করতে হল পারিবারিক গয়না। সেই টাকায় সহযোগীদের সাথে নিয়ে ২০১৩ সালের ১৮ই মে ছন্দা গায়েন প্রথম বাঙালি মহিলা পর্বতারোহী হিসাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন এবং সেই অভিযানের সময়ই ২০শে মে লোৎসে শৃঙ্গও জয় করেন। খরচ বাঁচানোর জন্য এবং রেকর্ড করার জন্য। এই কারণে একটি সংবাদ সংস্থা ৮ই অগাস্ট ২০১৩ তাঁকে 'সেরা আবিষ্কার' পুরস্কার দেয়। এরপর থেকে অর্থকষ্ট দূর হয়। অভিযানের স্পনসর হিসাবে বড় বড় কোম্পানি বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। ২০১৪ সালে অপর এভারেস্ট জয়ী রাজীব ভট্টাচার্যের সাথে পরিকল্পনা করে দুর্গম কাঞ্চনজঙ্ঘা (সমুদ্রতল থেকে ৮৫৮৬ মিটার) জয় করে ফেরার পথে আগে থেকে নেওয়া পরিকল্পনা অনুসারে খরচ বাঁচানো এবং রেকর্ড করার জন্য ইয়াংলু কাঙ অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজীব ভট্টাচার্য তার সহযোগীদের নিয়ে বেস ক্যাম্পে নেমে আসেন আর ছন্দা

গায়েন ৩ জন শেরপাকে নিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। ২০শে মে পথে প্রবল তুষার ধ্বস বা অ্যাভালাঞ্চ শুরু হয়। বেঁচে ফিরে আসা তৃতীয় সহযোগী তাশি শেরপার বক্তব্য অনুসারে অ্যাভালাঞ্চের সময় একটি বরফের চাঁই সরে যাওয়ার পা পিছলে ছন্দা এবং তার দুই সহযোগী দেওয়া ওয়াংচু এবং মিংঘা পেম্বা গভীর খাদে পড়ে যান। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এর একমাস আগে ৫ জন কোরীয় অভিযাত্রী এই অঞ্চলেই নিখোঁজ হয়ে যান।

সভ্যতার প্রায় সূচনাকাল থেকেই মানুষ বাধা এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে দুর্গম স্থানে যাত্রা করে আসছে। দুর্গম পথ এবং প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা অভিযাত্রীরা দেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়ার রাস্তা জয় করেছেন। হিমালয় পর্বতমালা, আন্দিজ, আল্পস-এর মত দুর্গম পর্বত, সমুদ্র, সাহারার মত মরুভূমি জয় করার প্রয়াস নিয়েছেন। এইসব অভিযান কেড়ে নিয়েছে অনেক তাজা প্রাণ, বিফল হয়েছেন অনেকে। তবুও একবার বিফল হলেও আবার সফল হওয়ার জন্য, বাধাকে জয় করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজা-অর্থবানরা বিভিন্ন ক্রীড়ায় সফল ব্যক্তিদের কখনও সখনও আর্থিক সহযোগিতা করতেন। অর্থের জন্য অন্যান্য খেলার মত পর্বত অভিযানও কারও পেশা ছিল না। পুঁজিবাদী যুগের সূচনার পর পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ক্রীড়ায় সফল ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতা শুরু করে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে। ধীরে ধীরে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট, বেসবল, সাঁতার ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতায় পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ শুরু করে। আস্তে আস্তে অধিকাংশ খেলোয়াড়রাই পেশাদার হয়ে ওঠে। কিন্তু পর্বত অভিযান এখনও সেই স্থান পায়নি। সাম্প্রতিকালে প্রচারের দৌলতে পর্বত অভিযাত্রীদের প্রচার বাড়ায় কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা বিজ্ঞাপনের বিনিময় আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেছে। এর জন্য বিভিন্ন কোম্পানি লোগো অভিযাত্রীদের পোশাকে লাগাতে হয়, শৃঙ্গে উঠলে কোম্পানির ঝান্ডা পুঁততে হয়, ভিডিও শো-তেও সংস্থার লোগো ব্যবহার করতে হয়। তবে এই অর্থ মূলত পর্বত আরোহণের বিশাল খরচ মেটাতেই শেষ হয়ে যায়। পুরস্কার ছাড়া অর্থ উপার্জনের সুযোগ নাই।

পর্বত অভিযানে অভিযাত্রীরা

১৮৫২ সালের এক মহান ত্রিকোণমিতি সার্ভের মাধ্যমে রাধানাথ শিকদার এবং আরও কয়েকজন হিমালয় পর্বতমালার কয়েকটি উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা মাপেন। প্রাক্তন অধিকর্তার নামে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম রাখা হয় মাউন্ট এভারেস্ট। বহু পর্বত আরোহী ঐ শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। ১৯২১ সালে তিব্বতের রাজা বাইরের লোকদের জন্য রাজ্যের দুয়ার খুলে দেওয়ার পর এই অভিযানের প্রয়াস শুরু হয়। ১৯২৪ সালে ৮ই জুন ব্রিটিশ অভিযাত্রী জর্জ মইলি প্রথম দুবার ব্যর্থ হওয়ার পর এভারেস্ট শৃঙ্গে পৌঁছান কিন্তু নেমে আসার সময় তুষার ঝড়ে হারিয়ে যান। ওনার দেহ আজও মেলেনি। বহু মানুষের বহু প্রয়াসের পর ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে নিউজিল্যান্ডের নাগরিক এডমুন্ড হিলারি এবং দার্জিলিং নিবাসী নেপালী শেরপা তেনজিং নোরগে প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। সাম্প্রতিককাল অর্থাৎ ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৮০টি দেশের প্রায় ৫০০০ মানুষ এভারেস্ট অভিযান করেছেন। অনেকেই বিফল হয়েছেন। কেউ আবার প্রথমে বিফল হলেও পরে সফল হয়েছেন। এই অভিযানে এখনও পর্যন্ত ২৬০ জনের জীবন গেছে। এবছর এপ্রিল মাসে এভারেস্ট অভিযানের সময় তুষার ধ্বসে ১৬ জন শেরপা একসাথে নিখোঁজ হয়েছেন। এভারেস্ট, কারাকোরামের গডউইন অস্টিন (K2), কাঞ্চনজঙ্ঘার মত সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি সমুদ্রতল থেকে ২৮ হাজার ফুট বা তারও বেশী উচ্চতায় অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা বলেন যে সমুদ্রতল থেকে ২৫ হাজার

ফুট উচ্চতায় বাতাসে মুক্ত অক্সিজেন সমতলের তিনভাগের একভাগ হয়ে যায়। উচ্চতা যত বাড়ে অক্সিজেনের মাত্রা তত কমে। এর সাথে রয়েছে প্রবল ঠান্ডা। এই কারণে এই অঞ্চলকে ডেথ জোন বা মৃত্যু অঞ্চল বলা হয়। এই পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কৃত্রিম অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া এভারেস্টের মত শৃঙ্গগুলি জয় করার বাসনা তৈরী হয় কিছু পর্বতারোহীর। ১৯৭৮ সালের ৮ই মে রেইনহোল্ড মেসনার এবং পিটার হ্যাবেলার প্রথম এই চ্যালেঞ্জে সফল হন। কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই তাঁরা এভারেস্ট জয় করে ফিরে আসেন। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ৬০ জন অভিযাত্রী কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয় করেছেন।

ওই উচ্চতায় প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন তা আমাদের মত সমতল বা মালভূমির বাসিন্দাদের জানা না থাকলে কল্পনা করাও মুস্কিল। মুক্ত অক্সিজেনের মাত্রা তিনভাগের একভাগ, তাপমাত্রা শীতকালে −৫০° সেলসিয়াসেরও কম (তাই মে এবং অক্টোবর ছাড়া যাওয়া যায় না, তখনও তাপমাত্রা −৩৫° থেকে −৪০° সেলসিয়াস)। এখানে সব সময় ঝোড়ো হাওয়া বয়, যা কখনও কখনও ঘন্টায় ১২৫ মাইলেরও বেশী। এর সাথে আছে অ্যাভালাঞ্চ, ক্রিভাসেস (হিমবাহগুলির প্রবল গতিতে ভেঙে পড়া)। চারদিকে শুধু সাদা, সবুজের চিহ্ন নেই। আলো পড়ে হিমবাহ থেকে তা প্রতিফলিত হয় ফলে খালি চোখ তাকানো যায় না।

এই অঞ্চলে শরীরে নানা অসুখ দেখা দেয়। হাইপোথারমিয়া, ফ্রস্ট বাইট বা তুষার দংশন, হাই অলটিচুড পালমোনারি ইডিমা (ফুসফুস ভয়ঙ্করভাবে তরলে ভর্তি হয়ে যাওয়া), হাই অলটিচুড সেরিব্রাল ইডিমা (অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক ফুলে ওঠা) ইত্যাদি কঠিন অসুখ অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। এছাড়া শরীরে যে উপসর্গগুলি দেখা যায় যেমন শরীরে শৈথিল্য, প্রবল মাথা যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, একসাথে দুটি জিনিস দেখা, বিভিন্ন কাজগুলিকে সমন্বয় করতে না পারা, ঠিকমত কোনও কিছুকে বিচার করতে না পারা, চোখে ধাঁধা লাগা ইত্যাদি।

এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য চাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষা, যে কোনও অবস্থার মোকাবিলা করার মানসিকতা এবং অসম্ভব শারীরিক ফিটনেস। প্রচন্ড ঠান্ডায়, প্রচন্ড দুর্গম পরিস্থিতিতে উলম্ব পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মত চলার সময় অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া আরও অনেক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। হাল্কা এবং নীচে কাঁটা লাগানো বিশেষ জুতো চাই। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে চাই পরতে পরতে তাপরোধ পদার্থ দেওয়া জ্যাকেট। ব্যাটারি, মাথার হেড ল্যাম্প, চোখের বিশেষ চশমা-স্কি গোগলস, দড়ি, ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ফোন, ওয়াকিটকি, বরফে চলার কুঠার (আইস অ্যাক্স), ক্র্যামাপনস, ক্যারাবিনার্স। রান্না করে খাওয়া এবং আলো জ্বালানোর জন্য টাইটেনিয়াম বার্নার এবং টাইটেনিয়াম পট ইত্যাদি।

এইসব পর্বত অভিযানের ক্ষেত্রে পর্বত আরোহীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে এবং ফিরিয়ে আনতে যারা অর্থ রোজগারের জন্য জীবন বাজি রাখেন সেই মানুষদের বলা হয় শেরপা। হিমালয়ে এইসব নেপালী এবং তিব্বতী শেরপারা জীবনধারণের জন্য যুগ যুগ ধরে এই কাজ করে আসছেন। খবরে এঁরা শিরোনামে থাকেন না। ছন্দা গায়েনের সাথে যে দুইজন শেরপার জীবন গেছে তারা অখ্যাতই থেকে যাবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এভারেস্টের মত সুউচ্চ ও দুর্গম শৃঙ্গগুলি জয় করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এখন লেখা হচ্ছে যে পর্বতারোহীর ভিড়ে এভারেস্টে জ্যাম জট সৃষ্টি হচ্ছে! এমন পর্বতারোহণের আদৌ উপযুক্ত নন এমন লোকেরা টাকার বিনিময়ে শেরপাদের নিজের পোষাক পড়িয়ে এভারেস্টে তুলে কৃতিত্ব প্রচার করছে। বিভিন্ন কোম্পানি এর জন্য টাকা দিয়ে নিজেদের প্রচার বাড়াচ্ছে ইত্যাদি।

এই সমালোচনা এক অর্থে সঠিক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফার জন্য সবই সম্ভব। কিন্তু এটা প্রচার করে প্রকৃত পর্বত অভিযাত্রীদের বাধা জয় করার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করা যায় কি?

অনেকে বলতে পারেন ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য যাঁরা পর্বত অভিযান করছেন তার কি সামাজিক মূল্য আছে? এঁরা বাধা অতিক্রমের নেশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস চালাচ্ছেন – তাতে কেউবা সফল হচ্ছেন, কেউবা ব্যর্থ। মানব প্রগতির জন্য, সমাজবিকাশের জন্য, শোষণ পীড়নহীন সমাজ গড়ার জন্য, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য যাঁরা দুনিয়াব্যাপী সংগ্রাম করছেন,তাঁদের লাগাতার কষ্টকঠিন কাজে ছন্দা গায়েনের মত পর্বত অভিযাত্রীদের জীবন প্রেরণা হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে পর্বত অভিযাত্রীদের বাধা অপসারণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রেরণা হয়ে ওঠে। এইসব পর্বত অভিযাত্রীদের জীবন থেকে সমাজ পরিবর্তনকারী মানুষেরা ইতিবাচক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ■

জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান

[প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তাশীল মানুষ অজানাকে জানার প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। চারপাশের জগৎ তথা প্রকৃতি এবং সেই জগতে ঘটে চলা নানা ঘটনার কারণ, মানবসমাজ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীর ও মন নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার কোন বিরাম নেই। মানব সমাজ, তথা মানুষের সৃষ্টি, এই পৃথিবীর সৃষ্টি, এই সৌরমন্ডল এমনকি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে লাগাতার। প্রথমতঃ পূর্ব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে যুক্তির বিকাশ হয়। প্রচলিত কাল্পনিক মতকে খন্ডন করতে জন্ম হয় যুক্তিবাদের। এর পাশাপাশি শুরু হয় সমগ্র পরিমন্ডলের মধ্যে কোন বস্তুকে জানার প্রয়াস। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বস্তুর জন্ম ও বিকাশের নিয়ম আবিস্কারের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বিজ্ঞানের। অজ্ঞেয়কে জানার প্রয়াসের মধ্যে প্রতিকূলতাকে জয় করার মধ্যেই মানবপ্রগতির সমস্ত শর্ত লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানের আলোয় আসুন আমরা মনের কোণে লুকিয়ে থাকা নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রতি সংখ্যায় আমরা নানা 'জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান' খুঁজব। –সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

বিভিন্ন উদ্ভিদ একই উপাদান হতে ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য দ্রব্য সংশ্লেষ করে কীভাবে?

সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে তাকে সাধারণভাবে শর্করা বা কার্বহাইড্রেট বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ও বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাস গ্রহণ করে তা সূর্যালোক ও সবুজ পাতায় অবস্থিত ক্লোরোফিলের সাহায্যে এক জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত কালে উদ্ভিদ প্রাথমিকভাবে গ্লুকোজ প্রস্তুত করে। পরবর্তী পর্যায়ে বহু গ্লুকোজ অনু সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ অনু শর্করা সংশ্লেষ করে যেমন – স্টার্চ, সেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি। এর মধ্যে সেলুলোজ অনুগুলি উদ্ভিদ কোষ প্রাচীর গঠনে কাজে লাগায়। অন্য শর্করাগুলি খাদ্য দ্রব্য হিসাবে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয় এবং মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন শস্য, কান্ড, মূল, পাতা ইত্যাদি মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ধান, গম ইত্যাদি শস্য। কান্ড হিসাবে আলু, আখ ইত্যাদি। মূল হিসাবে বীট, মিষ্টি আলু ইত্যাদি আবার ফল হিসাবে, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি বিচিত্র খাদ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ উদ্ভিদমূল। শর্করাজাতীয় খাদ্য ছাড়াও উদ্ভিদ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ সংশ্লেষ করে যেমন উৎসেচক, প্রোটিন, ফ্যাট বা তৈল; বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, উদ্ভিদ হরমোন, বিভিন্ন সুগন্ধি ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থগুলিকে সংশ্লেষ করার জন্য উদ্ভিদ মাটি থেকে সালফার, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, বিভিন্ন ধাতব মৌল যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি শোষণ করে যা উদ্ভিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জৈব প্রক্রিয়াগুলি যেমন বৃদ্ধি, প্রজনন, ফল ও ফুলের উৎপত্তি ও বিকাশ ইত্যাদি জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সচল রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদকূল তার জীবনচক্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি পরিবেশ থেকেই সংগ্রহ করে।

এখন প্রশ্ন হল সমস্ত উদ্ভিদ একই উপাদান হতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে কীভাবে? কেনই বা একই প্রজাতির গাছ থেকে ভিন্ন স্বাদের ফল মূল উৎপন্ন হয়? আমগাছ থেকে কেবল আমই পাওয়া যায় আবার লিচু গাছে লিচুই হয়। এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে জেনেটিক্স বা জিনবিদ্যায়। আম বা লিচুর বীজের মধ্যে 'জিন' নামক যে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ আম বা লিচু গাছ হিসাবে বহিঃপ্রকাশ হবার শর্ত। এ হ'ল অভ্যন্তরীণ শর্ত। তবে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শর্ত থাকলেই হবে না। বীজ থেকে উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত বাহ্যিক শর্তও সমানভাবে আবশ্যিক। তাই, একটি

আমের বীজকে রেফ্রিজারেটরের ভিতর রাখলে বা মরুভূমির তপ্ত বালির উপর দীর্ঘদিন রেখে দিলেও অঙ্কুরোদ্‌গম হবে না। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শর্তের যথাযথ মিলনের ফলেই ঘটে বীজের অঙ্কুরোদগম। চারাগাছ ক্রমশঃ মহীরূহ'র আকার ধারণ করে, গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়। ফল ক্রমশঃ রসাল হয়ে ওঠে, রং পরিবর্তন করে। সুগন্ধি ছড়ায়, সুস্বাদু হয়। আর এই সমস্ত কিছুর জন্যই অভ্যন্তরীণ শর্তের পাশাপাশি বাহ্যিক শর্তের প্রয়োজন হয়। বাহ্যিক শর্ত বলতে বোঝায় পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মৃত্তিকার আর্দ্রতা, অম্ল-ক্ষারের মাত্রা, মৃত্তিকার উপাদান ইত্যাদি। ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহ্যিক শর্তেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একই ফলের বিভিন্ন প্রজাতিও দেখা যায়। যেমন আম বলতে কেবলমাত্র আমই বোঝায় না। হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, পেয়ারাফুলি, গোলাপখাস, আলফানসো আরও কত কি। আকার-আকৃতিতে যেমন রয়েছে বিভিন্নতা, স্বাদে-গন্ধেও রয়েছে কত বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য জিনের গঠন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এইভাবে শত বৈচিত্র্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ শর্ত, শত বৈচিত্র্যপূর্ণ বাহ্যিক শর্তের মিলনের ফলেই শত সহস্র বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এর ফলেই বিভিন্ন স্বাদ গন্ধ সম্পন্ন, বিভিন্ন মিষ্টতা সম্পন্ন ফল মূলের সৃষ্টি হয়। যদিও তা সৃষ্টি হয় একই উপাদান থেকে। সত্যি, প্রকৃতি কত বৈচিত্র্যময়! ■

নদী অথবা হ্রদের জল মিষ্টি কিন্তু সমুদ্রের জল নোনতা কেন?

হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য মানুষের মনে এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে এর নানান ব্যাখ্যা আছে। রামচরিত মানস-এ আছে যে রামভক্ত হনুমান বলেছেন যে লঙ্কা অভিযানের সময় সেতুবন্ধনের প্রয়োজন পড়ে। রাম তখন অশান্ত সমুদ্রকে শান্ত করার জন্য যজ্ঞে বসেন। সমুদ্রদেব তখন সমুদ্রকে শান্ত না করায়, ক্ষিপ্ত রাম সমুদ্রে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেন। সেই বানে সমুদ্র শুকিয়ে যায়। তখন সমুদ্র উপকূলবাসীদের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়। উপকূলবাসী নারীরা বিশেষতঃ রাক্ষসী রমণীরা তখন ভয়ে, দুঃখে কাঁদতে থাকেন। অসংখ্য রাক্ষসী রমণীর ক্রন্দনের ফলে তাদের চোখ নিঃসৃত নোনতা জলে ধীরে ধীরে সমুদ্র আবার ভরে ওঠে এবং নোনতা হয়ে যায়।

হিন্দু পুরাণের অপর এক কাহিনীতে বলা আছে যে একবার একটি পাখি সমুদ্র উপকূলে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে তিনটি ছানা হয়। সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই তিন ছানাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাখিটি উড়ে উড়ে সমুদ্র জুড়ে তার বাচ্চাদের খুঁজে না পেয়ে ডানা দিয়ে জল তুলে ডাঙ্গায় ফেলতে থাকে। অগস্তমুনি ঘটনাটি দেখে পাখিটির কাছে ঘটনাটি জানতে চায়। পাখিটি তাঁকে সব বলে। এতে অগস্ত মুনি তাকে আশ্বস্ত করে যজ্ঞে বসেন। সমুদ্রের ঢেউ মুনির যজ্ঞ পন্ড করে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ মুনি দুহাতের আজলা ভরে সমুদ্রের জল তুলে ফেলে দেন। অমনি সমুদ্র শুকিয়ে যায়। সমুদ্রদেব তখন মুনির কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মুনি তখন সমুদ্রদেবকে তাঁর জল ফিরিয়ে দেন কিন্তু জলকে পানের অযোগ্য বিষাক্ত নোনতা করে দেন।

ফিলিপাইন্সের এক পৌরাণিক কাহিনীতে বলা আছে যে বহু যুগ আগে এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলে এক বিরাট গুহা ছিল। সেই গুহায় থাকত অ্যাসং নামক এক বিরাট দৈত্য। সে এত বড় ছিল যে তিনদিনে পৃথিবীর অর্ধেক ঘুরে আসতে পারত। অ্যাসং, গ্রামের মানুষদের জন্য পাহাড় থেকে প্রতিদিন নুন এনে দিত। গ্রামটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একদিন অন্য অঞ্চলের মানুষেরা সেটা জানতে পেরে ওই গ্রামটি তাদের অধীনে আনতে চায় এবং গ্রামবাসীদের তাদের জন্য আরও নুন দিতে বলে। ওই অঞ্চলের মানুষেরা জানত যে গ্রামবাসীদের সাথে দৈত্যের সম্পর্ক আছে। তারা তখন অ্যাসংকে বন্দী করতে চায়, যাতে ঐ দৈত্য তাদের জন্য সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে। খবর শুনে দৈত্য ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ক্রোধই তার পতন ডেকে আনে। একদিন অ্যাসং যখন গ্রামবাসীদের জন্য বস্তা বস্তা নুন নিয়ে আসছে পাহাড় থেকে তখন অন্য অঞ্চলের মানুষেরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল জারে ভরা বিষাক্ত পিঁপড়ে নিয়ে। অ্যাসং যখন সমুদ্রের পাড়ে পৌছায় তখন শত্রুরা তার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ে ছেড়ে দেয়। পিঁপড়েদের কামড় সামলাতে না পেরে অ্যাসং সমুদ্রে পড়ে যায় নুনের বস্তাগুলো সমেত। গ্রামবাসীরা তখন জেগে উঠে

অনুপ্রবেশকারীদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অ্যাসং এত বিশাল আকারের ছিল যে তাকে সমুদ্র থেকে তুলতে পারে না। গ্রামবাসীরা দৈত্যের কীর্তির জন্য শ্রদ্ধা জানায় এবং তার শরীর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। সময়ের সাথে সাথে অ্যাসং একটি পূর্ণাঙ্গ ভূখন্ডে পরিণত হয় এবং তার নামেই এই ভূখন্ডের নাম হয় এশিয়া এবং সমুদ্র হয়ে যায় লবনাক্ত।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের এই সহজ প্রশ্ন – সমুদ্রের জল নোনতা কেন? এর উত্তর তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা ভাববাদের আশ্রয় নিয়ে এভাবেই দিয়ে এসেছেন। এগুলিই হল পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু এইসব ভাববাদী কাহিনী মানুষের প্রশ্নের সমাধান দেয়নি। প্রশ্ন থেকেই গেছে।

আধুনিক যুগে পৌঁছবার আগেই যুক্তিবাদীরা এইসব পৌরাণিক কাহিনী খন্ডন করেছেন কিন্তু প্রকৃত কারণ অর্থাৎ বিজ্ঞান না জানায় সঠিক উত্তর মেলেনি। আধুনিক যুগে সমাজের মালিকদের স্বার্থেই বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার বাড়তে থাকে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ অংশই সমুদ্র। পৃথিবীতে যত জল আছে তার ৯৭ ভাগই সমুদ্রের জল এবং নোনতা। এই জলে যত কণা দ্রবীভূত থাকে তার আবার প্রায় ৯০ শতাংশই সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ নুন। কেন?

আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে মহাদেশের নদী-হ্রদ-খাল-বিলের জলের তুলনায় সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত সব ধরনের আয়ন বেশী থাকে।

মহাদেশের মিষ্টি জলে দ্রবীভূত আয়ন থাকে ০-৫ কণা প্রতি হাজার কণায় অর্থাৎ সর্বোচ্চ ০.৫% (০.৫ গ্রাম প্রতি লিটারে)। অন্যদিকে সাধারণ সমুদ্রের নোনতা জলে আয়নের পরিমাণ থাকে ৩০-৫০ কণা প্রতি হাজার কণায় অর্থাৎ ৩-৫% (গড়ে ৩.৫%) গ্রাম আয়ন প্রতি লিটারে। আর স্থির এবং বদ্ধ সমুদ্র বা লেগুন অঞ্চলের নোনা জল (Brine water)-এ আয়নের পরিমাণ থাকে প্রতি হাজার কণায় ৫০ কণার অধিক অর্থাৎ ৫% শতাংশের অধিক (> ৫ গ্রাম আয়ন প্রতি লিটারে)। এই দ্রবীভূত আয়নের জন্য মিষ্টি জলের ঘনত্ব তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার উপর ভিত্তি করে হয় ১.০২০-১.০২৯ গ্রাম/লিটার। সমুদ্রের জলের গড় ঘনত্ব হয় ১.০৫০ গ্রাম/লিটার। এর ফলে সমুদ্রের জল লবণাক্তা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক বেশী ঘন হয় তাপমাত্রা এবং pH মাত্রার উপর। সাধারণভাবে মিষ্টি জলে অ্যাসিড-ক্ষার মাত্রা বা pH ৭ বা তার কম হয় (সামান্য অ্যাসিডিক বা আম্লিক) এবং সমুদ্রের নোনতা জলের pH ৭.৫-৮.৪ হয় (তুলনায় ক্ষারীয়)। যদিও এই অ্যাসিড ক্ষারের মাত্রা এবং দ্রবণের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে সমুদ্রের জলে বিভিন্ন মৌল এবং তার ভরের হার ৩.৫% গড় লবণাক্ত অবস্থায় যা থাকে তা নিম্নরূপ –

মৌল	ভর (%)
O	৮৫.৮৪
H	১০.৮২
S	০.০৯১
Ca	০.০৪
Cl	১.৯৪
Na	১.০৮
Mg	০.১২৯২
K	০.০৪
Br	০.০০৬৭
C	০.০০২৮
Si	অতি ন্যূনতম মাত্রায়
P	”
N	”

সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত আয়নগুলির পরিমাণ মহাদেশের নদী-হ্রদ-খাল-বিল সব ধরণের জলের তুলনায় বেশী। যদিও দ্রবীভূত আয়নগুলির অনুপাত বিভিন্নরকম হয়। যেমন বাইকার্বনেট আয়নের পরিমাণ সমুদ্রের জলে নদীর জলের তুলনায় ২.৮ গুণ বেশী (মোলারিটি অনুসারে) হওয়া সত্ত্বেও শতাংশের হিসাবে সমুদ্রজলে বাইকার্বনেটের পরিমাণ (সমস্ত দ্রবীভূত আয়নের পরিমাণ নদীর জলের তুলনায়) অনেক কম। নদীর জলে বাইকার্বনেট আয়ন (যৌগমূলক)-এর পরিমাণ সমস্ত দ্রবীভূত আয়নের তুলনায় ৪৮ শতাংশ অথচ সমুদ্র জলে তার পরিমাণ সমস্ত দ্রবীভূত আয়নের তুলনায় মাত্র ০.১৪%। সমুদ্রতলে বিভিন্ন আয়নের অনুপাত নদীর জলের তুলনায় এত পার্থক্য হওয়ার মূল কারণ হল জলে দ্রবীভূত আয়নগুলির **রেসিডেন্স টাইম** (দ্রবীভূত থাকার সময়)-এর পার্থক্য। এই রেসিডেন্স টাইম হল – একটি মৌল বা আয়ন সমুদ্রজলে কতক্ষণ দ্রবীভূত থাকে, তা নির্ণয় করা হয় এই সূত্রের সাহায্যে যে সমুদ্রজলে একটি মৌল বা আয়নের পরিমাণ/ সেই মৌল বা আয়ন কত পরিমাণে নদী সমুদ্রে নিয়ে আসে (প্রতিবছরে কত টন)। **সমুদ্র জলে এই রেসিডেন্স**

টাইম সর্বাধিক হল দুটি আয়নের ক্ষেত্রে Na+ এবং Cl^-। Na^+ এবং Cl^- সমুদ্র জলে অধঃক্ষেপিত না হয়ে দ্রবীভূত থেকে যেতে পারে ১০ কোটি বছর পর্যন্ত। Ca^{++} এবং Mg^{++} আয়নের ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক ১০ লক্ষ বছর। কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট, সিলিকন ইত্যাদি আয়ন বা যৌগমূলকের ক্ষেত্রে তা কয়েকশত বা কয়েক হাজার বছর মাত্র।

আমরা জানি যে মহাদেশের উপর বৃষ্টিপাতের ফলে যে জলধারা সমুদ্রে নেমে আসে তা সামান্য আম্লিক হওয়ায় পাথরের উপর সেই জল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে। পাথরের খনিজগুলি এই ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নানা যৌগ, যৌগমূলক এবং আয়নে বিভাজিত হচ্ছে। মহাদেশের পাথরগুলি যার দ্বারা সৃষ্ট তার মধ্যে O, Si, Al, K, Na, Mg, Fe, Ca, বেশী থাকে। Al এবং K মাটিতে ভাল পরিমাণ শোষিত হয়ে ক্লে মিনারেল (হাইড্রেটেড পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট) গঠন করে পলি হিসাবে জমা হয়। Fe বিভিন্ন অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইড যৌগ গঠন করে মহাদেশের মাটিতেই অধঃক্ষেপিত হয়, তাই সমুদ্র জলে Mg আয়ন Fe আয়ন অপেক্ষা বেশী। মহাদেশীয় পাথরে Ca এবং Cl এর মাত্রা কম থাকলেও এই Cl আয়ন প্রায় সবটাই এবং Ca আয়নের বড় অংশ নদীর জলে দ্রবীভূত থেকে যায় এবং প্রায় সবটাই সমুদ্রে পতিত হয়। এই কারণে সমুদ্র জলে সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, সালফেট এবং ক্যালসিয়াম আয়ন অন্যদের চেয়ে বেশী হয়। যুগ যুগ ধরে নদী বাহিত জল এই মৌলগুলিকে সমুদ্রে এনে ফেলে। এদের মধ্যে সিলিকন (Si), সিলিকা (SiO_2) হিসাবে, Ca^{2+}, এবং CO_3^{-2}, SO_4^{-2} ক্যালসিয়াম কার্বনেট হিসাবে বা ক্যালসিয়াম সালফেট হিসাবে অধঃক্ষেপিত হয়ে যায় অনেক দ্রুত। কিন্তু **নদী বাহিত জল আনিত Na^+ এবং Cl^- যুগ যুগ ধরে সমুদ্র জলে থেকে যায়, তাই সমুদ্রের জল এত নোনতা হয়।**

সমুদ্রজলে লবণাক্ততার মাত্রা স্থান, কাল এবং পরিবেশের ভৌত অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের লবণাক্ততা আটলান্টিক সাগরের লবণাক্ততার চেয়ে বেশী। এর কারণে প্রশান্ত মহাসাগর আয়তনে বড়, আয়ন মিশ্রিত জলধারণ ক্ষমতা বেশী কিন্তু সেই সাগরে তুলনায় অনেক কম নদী এসে পড়েছে কম জল নিয়ে। কিন্তু এই সাগরের প্রায় চতুর্দিকে আগ্নেয়গিরি আছে যে আগ্নেয়গিরি থেকে নিয়মিত লাভা নিঃসৃত হয় এবং যাতে প্রচুর লবণ ও লবণজাত পদার্থ থাকে যা সমুদ্রের জলকে বেশী নোনতা করে। উল্টোদিকে আটলান্টিক সাগর আয়তনে ছোট, তার দুই পাড়ে আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশ (উত্তর ও দক্ষিণ) থেকে প্রচুর নদী নিয়মিত জল নিয়ে আসে এবং এই সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অগ্নুৎপাত (ফিশার ইরাপশন) প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিবলয়ের তুলনায় কম। সমুদ্রে দ্রবীভূত আয়ন এবং জলের পরিমাণের অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর লবণাক্ততার পার্থক্য হয়। **দ্রবীভূত Nacl বেশী আয়তন জলে থাকলে লবণাক্ততা কমে।** যে সকল অঞ্চলে সমুদ্রের জল মূল সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশের মাঝে আটকে আছে যেমন ডেড সি বা মৃত সাগর, ক্যাসপিয়ান সি, এন্তরিক বেসিন অঞ্চলে সমুদ্রের জলে নুনের মাত্রা অনেক বেশী (হাইপার স্যালাইন) কারণ এই সমুদ্রগুলিতে গ্রীষ্মকালে এবং সারা বছর যে বাষ্পায়ন (ইভ্যাপোরেশন) হয় সমুদ্রে আসা জলের পরিমাণ তার চাইতে অনেক কম। এই কারণে এইসব সমুদ্র অতি লবণাক্ত এবং জলের ঘনত্ব অনেক বেশী। তাই জাহাজ এখানে সহজে ভাসে।

সমুদ্রের জলে লবণ শুধু নদী বাহিত জলেই আসে না। এর সাথে সাথে সমুদ্রের নীচের পাথরের ফাটল থেকে আসা হাইড্রোথারমাল ওয়াটার (গরম খনিজ লবন মিশ্রিত জল), আগ্নেয়গিরির জল লবণের পরিমাণ বাড়ায়।

সমুদ্রের লবণাক্ততা মোটামুটিভাবে স্থির থাকে লক্ষ লক্ষ বছর যদি সেই সমুদ্রে টেকটনিক (ভূঅস্থিতিশীলতা জনিত) ও রাসায়নিক পরিবর্তন না হয়। সমুদ্রের জলে নদী এবং অন্যান্য উৎস থেকে লবণমিশ্রিত জল শুধু যোগ হয় এমন নয়। সমুদ্রের জলের লবণ বাষ্পায়নের ফলে পাড়ে এবং সমুদ্রের নীচে সোযিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি খনিজ হিসাবে জমাও হয় (ইভাপোরাইট ডিপোজিট), পাথরের ছিদ্রের মধ্যে জমা হয় এবং সমুদ্রের ত্বকের বেসল্ট পাথরের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য যৌগে রূপান্তরিত হয়। এই কারণে সমুদ্রের জলের লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধির হার দীর্ঘকাল মোটামুটি একই থাকে।

শুধু তাই নয় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমুদ্রের জল বছরের মধ্যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। **বর্ষার সময় নদী ধৌত জল এবং বৃষ্টিপাতের ফলে জলে লবণাক্ততা কমে আবার শুখা মরশুমে বাষ্পায়নের হার নদী ধৌত জল ও বৃষ্টিপাতের ফলে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত জলের চেয়ে বেশী হওয়ায় সমুদ্রের জলে লবণাক্ততা বাড়ে।**

২০০৬ সালে মুম্বাই উপকূলে উপকূলবাসীরা হঠাৎ উপলব্ধি করেন সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা কমে গেছে। তখন ধর্মীয়

উপাসকরা প্রচার করতে থাকেন ঈশ্বরের আশীর্বাদে সমুদ্রের জল এখানে মিষ্টি হয়ে গেছে এবং এই মিষ্টি জল পান করলে রোগ মুক্তি ঘটবে। সেই কথা শুনে হাজার হাজার মানুষ ঘড়া ভরে সমুদ্রের জল নিয়ে গিয়ে পান করতে থাকেন। এতে বহু অসুখ-বিসুখ হয়। প্রকৃতপক্ষে সেবছর ভারতের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হয়েছিল। সময়টা ছিল জুলাই-অগাস্ট। ফলে জলের লবণাক্ততা সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল।

শুধু সমুদ্রের জল নয়, সমুদ্রের সাথে যুক্ত নদীর মোহনায় এবং যেসব নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে সেখানকার জলও লবণাক্ত। ভাটার তুলনায় জোয়ারের জল বেশী লবণাক্ত। সমুদ্রের থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু অতীতে সমুদ্রের অংশ ছিল এমন জলাশয় – লেগুন ইত্যাদিও প্রচন্ড লবণাক্ত।

সামুদ্রিক জলের লবণাক্ততার হারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। লবণাক্ততার হিসাবে যেসব প্রাণী সমুদ্রে থাকে তাদের ইউরিহ্যালাইন, স্টেনোহ্যালাইন ইত্যাদি বলা হয়।

পৃথিবীর সমুদ্রে মোট নুনের পরিমাণ কত? বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে এর পরিমাণ গড়ে প্রতি লিটারে ৩.৫ গ্রাম। পৃথিবীর সব সমুদ্রকে শুকিয়ে দিলে যত নুন পাওয়া যাবে তা গোটা পৃথিবীর উপর জমা করলে তার উচ্চতা হবে ৫০০ ফুট বা প্রায় ১৬৬ মিটার। পরিমাপ হিসাবে প্রায় ১২০০ লক্ষ টন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমুদ্রের জল কি প্রথম থেকেই নোনতা ছিল ?

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টির পর আজ থেকে ৩৮০-৪০০ কোটি বছর আগে ভয়াবহ ও ধারাবাহিক অগ্নুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত খনিজ লবণ ও ধূলিকণা মিশ্রিত জলীয় বাষ্প প্রবল মেঘের জন্ম দেয়। সেই মেঘ উপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় যা ছিল আম্লিক। এই অম্লবৃষ্টি পাহাড় পর্বতের পাথরের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে নানা রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত জল বয়ে এনে পৃথিবীর নিচু অঞ্চলে জমা হয়। সৃষ্টি হয় সমুদ্রের। প্রাথমিক অবস্থায় সমুদ্রের লবণাক্ততা আজ থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও পরবর্তীকালে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের গড় লবণাক্ততা মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থান-কালের বৈষম্যভেদে। ■

তথ্যসূত্র ঃ

* দ্য হিন্দু – কোয়েশ্চেন কর্নার ১৭.৪.২০১৪
* প্রিন্সিপালস অফ সেডিমেন্টোলজি – এস এম সেনগুপ্ত
* নেচার পত্রিকা
* উইকিপিডিয়া
* ইউ এস জি এস এর ওয়েবসাইট
* ভারতীয় পুরাণের নানা কাহিনী

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর

সমুদ্রের নোনা জল আর নোনা জমিতে কৃষি এখন বাস্তব

পৃথিবীতে যত জল আছে তার ৯৭ শতাংশই সমুদ্রের নোনা জল। মহাদেশের বরফ আবৃত অংশ বাদ দিলে মাত্র ২.৫ শতাংশ নদী-হ্রদ-খাল-বিল-এর মিষ্টি জল বা ফ্রেস ওয়াটার। মানুষের আয়ত্তে আছে মাত্র ১ শতাংশ মিষ্টি জল। এই মিষ্টি জলই আমরা পান করি, কৃষিকাজ চালাই, গবাদি পশুরা পান করে এবং অন্যান্য কাজে তা ব্যবহার করি। যদিও এখন আরব দেশগুলি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমুদ্রের নোনা জলকে লবণমুক্ত করে তা পানের উপযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর এই বিপুল লবণাক্ত জলরাশিকে কৃষিকাজে লাগালে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের কথা হয়ত মানুষের কল্পনাতেও আসবে না। এই কারণে সমুদ্রের নোনা জল আর অকৃষিযোগ্য নোনা জমিতে চাষ করার বাস্তবতা নিয়ে বেশি কিছুদিন যাবত গবেষণা চলছে বিশ্বজুড়ে।

নাসার ‘ল্যাঙ্গলি রিসার্চ সেন্টার’-এর প্রধান বিজ্ঞানী ডেনিস বুশনেল সম্প্রতি জানিয়েছেন যে এটা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীর ১০ শতাংশ জমিকে উর্বর কৃষিযোগ্য বলা হয় প্রচলিত চাষের জন্য। পৃথিবীর মোট জমির অর্ধেক হচ্ছে মরুভূমি, নোনাভূমি, সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা জমি। এছাড়া রয়েছে ৫টি বড় মহাসাগর এবং কয়েকটি ছোট-বড় সাগর। নাসার বিজ্ঞানীদের মতে এইসব অকৃষিযোগ্য জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির লবণাক্ততা সহ্যকারী উদ্ভিদ (সল্ট টলারেন্ট প্ল্যান্ট) চাষ করা সম্ভব।

বিজ্ঞানী বুশনেলের মতে নোনা জলে চাষের ধারনা নতুন নয়। ইসরায়েলে, ভারতে এবং বিভিন্ন শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলের

মানুষের দ্বারা ছোট আকারে নোনা জলে চাষের প্রয়াস হয়েছে কয়েকশত এমনকি হাজার হাজার বছর আগে থেকে। কিন্তু এই নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছে বিগত ২ দশক ধরে দুটি প্রধান কারণে – মিষ্টি জলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং বায়োফুয়েল বা উদ্ভিদ জ্বালানি তৈরীর উদ্দেশ্যে। নাসার ল্যাঙ্গলি গবেষণাকেন্দ্রই প্রথম নোনাজলে কৃষির ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ে এসেছে। গত ৫-৬ বছর ধরে নোনা জলে বায়োফুয়েল বা জ্বালানি উদ্ভিদ চাষ বাস্তবরূপ পেয়েছে।

শুধু নাসা নয়, বেশ কিছু বেসরকারী গবেষণা সংস্থাও এখন এই গবেষণায় লিপ্ত। বোয়িং, হলিওয়েল এবং দ্য ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এতিহাদ এয়ারলাইন-এর একটি কনসর্টিয়াম একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আবু ধাবির প্রচণ্ড লবণাক্ত মরুভূমির মাটিতে যা কিনা আরব উপসাগরের লবাণাক্ত জল দ্বারা সিক্ত। এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের জমিতে জ্বালানি উদ্ভিদ (বায়োফুয়েল) চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে জ্বালানি উৎপাদন করা।

সরকারী এবং বেসরকারী বৃহৎপুঁজির কোম্পানিগুলির উদ্যোগে চলা এই গবেষণাগুলির অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যশস্য উৎপাদন নয়, জ্বালানি উদ্ভিদ উৎপাদন। কোম্পানিগুলি সেই লক্ষ্যেই বিনিয়োগ করছে। তবে নোনা জলাভূমিতে উৎপাদিত উদ্ভিদ স্যালিকর্নিয়া (Salicornia) ইংলন্ডবাসীর কাছে খুব সুস্বাদু খাদ্য যা জ্বালানি উদ্ভিদ হিসাবে উৎপাদন করা হচ্ছে।

দুবাই ভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োস্যালাইন এগ্রিকালচার'-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড: ইমাহানে ইলৌফি তাঁর টিম নিয়ে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্যকারী অথচ প্রথাগতভাবে চাষ করা হয় এমন উদ্ভিদ যেমন পাম, সরগুম এবং মিলেট নিয়ে গবেষণা করছেন। এরা হ্যালোটাইপ (সামুদ্রিক উদ্ভিদ) নয় কিন্তু সমুদ্র উপকূলের গভীরে ফলতে পারে অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন ধান – গমের চাইতে বেশি। এই গবেষণা কেন্দ্রটি মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার ফার্মারদের সাথে নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে এবং তাদের এইসব লবণাক্ততা সহ্যকারী উদ্ভিদের চারা বিতরণ করছে। কিন্তু শ্রীমতী ইলৌফির মতে আন্তর্জাতিক কৃষিবাজার ও অর্থনীতি অন্য জিনিস। তাঁর মতে "মাল্টিন্যাশনালরা সেই প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দেয় এবং বাজারে তারই প্রভাব পড়ে যাকে তারা চাম্পিয়ান করে।" ড: ইলৌফি মন্তব্য করেন "আমরা বায়ো ডাইভারসিটি এই কারণে ব্যবহার করি না যে তার অস্তিত্ব নাই। বরং এই কারণে যে বিশ্ব বাজার খুবই প্রতিযোগিতামূলক এবং একমাত্র মেগা প্রোডাকশন সিস্টেমই (বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা) তাকে বাঁচাতে পারে।"

বিজ্ঞানী বুশনেল মন্তব্য করেছেন যে এই গবেষণায় সাধারণের হাত থাকে না। পেটেন্ট নিয়ে যে কোম্পানি টাকা রোজগার করবে তাদেরই হাতে থাকবে। তাই খাদ্যশস্য যেমন ধান,গম, ভুট্টার বিকল্প চাষের বদলে নোনা জলে বিকল্প খাদ্য শষ্য চাষ বিস্তার লাভ করতে পারে যদি তার বাণিজ্যিক উৎপাদন লাভজনক হয়।

অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা বর্তমানে সবই বৃহৎ একচেটে পুঁজিকোম্পানিগুলির কুক্ষিগত। তারা তাদের বাজারের স্বার্থেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়। বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে এই গবেষণাগুলি চালালেও গবেষণার ফল চলে যায় কোম্পানিগুলির হাতে। মুনাফাদায়ী ক্ষেত্রেই তারা বিনিয়োগ করে অন্যত্র নয়। এখন খাদ্যশস্যের বাজারে চলছে অতি উৎপাদনের সংকট। FAO -এর রিপোর্ট তাই বলছে। তাই নোনা জমিতে সেইসব চাষে তাদের উৎসাহ নেই। উৎসাহ আছে বায়ো ফুয়েল উৎপাদনে। বর্তমানে নোনা জমিতে কৃষির প্রধান উদ্দেশ্যই তাই। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল তারা কুক্ষিগত করে রাখলেও সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হওয়ায় আপামর বিশ্ববাসী বিজ্ঞানের এই মহান আবিষ্কারগুলির ফল একদিন করায়ত্ত করবেই। [সূত্র ঃ http://www.ozy.com]

মঙ্গলগ্রহে কিউরিওসিটির বর্ষপূর্তি

মঙ্গলগ্রহে নাসা'র পাঠানো স্বয়ংক্রিয় গবেষণা করার যন্ত্র যান কিউরিওসিটি রোভার সে গ্রহে থাকার একবছর পূর্ণ করল। গত ৬ই অগাস্ট ২০১২ সালে সূর্যের লালগ্রহ মঙ্গলে কিউরিওসিটি অবতরণ করে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে মঙ্গলগ্রহের সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ৬৮৭ দিন। অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেমন ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় একবছর হয় তেমনি মঙ্গলের ক্ষেত্রে একবছর ৬৮৭ দিনে। গত ২৪ শে জুন ২০১৪ কিউরিওসিটির মঙ্গলে বিচরণের একবছর পূর্ণ হল।

নাসা'র মত অনুসারে কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গলে অবতরণ করিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করার মিশন তাদের ছিল তা সফল হয়েছে। যদিও প্রায় কোন তথ্যই তারা বিজ্ঞানী বা

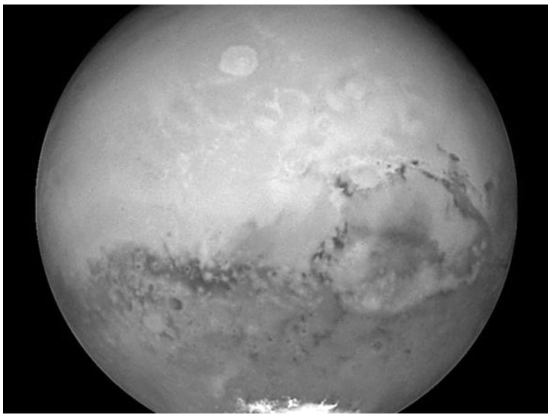

সূর্যের লাল গ্রহ মঙ্গল

জনসাধারণকে দেয়নি। নাসার মঙ্গলগ্রহে কিউরিওসিটি পাঠানোর উদ্দেশ্যে কী ছিল? নাসার ঘোষণা প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল ওই গ্রহে একসময় অতি ক্ষুদ্র জীব-এর (মাইক্রোবিয়াল লাইফ) থাকার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল কি না? তা জানা। নাসার অধিকর্তাদের মতে এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

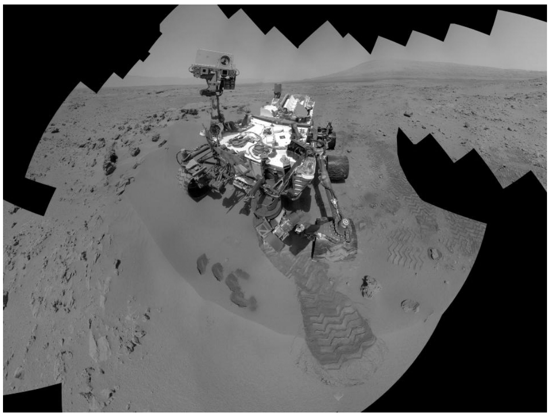

মঙ্গলগ্রহে কিউরিওসিটি

মঙ্গলে অবতরণের পর কিউরিওসিটি প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের উপস্থিতি ওই গ্রহে খুঁজে পায় তা হল একটি নদীগর্ভের (রিভারবেড) উপস্থিতি। কিউরিওসিটি যন্ত্রযানটি যেখানে প্রথম অবতরণ করেছিল তার কাছেই (নাসার দেওয়া নাম অনুসারে ইয়েলো নাইফ বে) এই নদীগর্ভের উপস্থিতি প্রথম নজরে আসে। এই অঞ্চলে একটি ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির মুখ (বাটির আকারের এক বিশাল গর্ত) অবস্থিত। কিউরিওসিটি খুঁজতে থাকে এখানে কোনও আদি

মঙ্গলগ্রহে নদীর বেড

প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা? ওই অঞ্চলে ওই যন্ত্রযান মাটিতে ড্রিল করে বা গর্ত খুঁড়ে ২টি কাদাপাথর-এর (মাড স্টোন) টুকরো তুলে এনেছে।

এই দুটি পাথরের স্যাম্পেল বিশ্লেষণ করে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে সুদূর অতীতে এই অঞ্চলে একটি হ্রদ (লেকবেড) ছিল। এই হ্রদে অল্প পরিমাণ জল বা তরল পদার্থ ছিল এবং এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে অনুজীবগুলি (মাইক্রোবস) যে রাসায়নিক শক্তির উৎসের উপস্থিতি থাকলে বেড়ে উঠতে পারে মঙ্গলের ওই অঞ্চলে তখন প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করত। মঙ্গলে যদি তখন প্রাণের উপস্থিতি থেকে থাকে তবে ওই অঞ্চল ছিল তাদের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান। নাসা একথাও জানিয়েছে যে ওই স্বয়ংক্রিয় চলমান যন্ত্রযান মঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা পাথরের গুঁড়োর স্যাম্পেল সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে। এগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এছাড়া ওই চলমান স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযান মঙ্গলের নদীগর্ভের যে ছবি পাঠিয়েছে এবং কাদাপাথরের স্যাম্পেল দুটিতে পাথরের যে গঠন দেখা গেছে তা দেখে পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে জল বা জলীয় কোনও তরলের উপস্থিতি ছাড়া, একটি বিশেষ হাইড্রোডায়নামিক অবস্থা ছাড়া ওই অঞ্চলের পাললিক শিলায় তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কিউরিওসিটি সুদূর অতীতে মঙ্গল গ্রহে জলের বা জলের মত তরলের উপস্থিতি, নদী গর্ভ, হ্রদের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে কিন্তু সেই পরিবেশে প্রাণের সম্ভাবনা প্রবল থাকলেও তার উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ দিতে পারেনি। ■

[তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৫.৬.১৪]

অদৃশ্যগতি দৃশ্যমান করে তুলতে EulerianVideo বৃহত্তরীকরণ হাতিয়ার – সর্বক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার

ছোটবেলায় অনেকেই রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আকাশে তারা দেখার জন্য কালো আকাশের দিকে একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছি। খালি চোখে অথবা মেঘলা আকাশে অনেকসময় সব তারাদের দেখাও মিলত না। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারোর কাছে বায়নোকুলার থাকলে, সেটি চোখে লাগালে অদৃশ্য তারাই হয়ে উঠত দৃশ্যমান। এমনভাবেই কোনও একদিন হয়তো বিজ্ঞানী গ্যালিলেই গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে অদৃশ্য কোনো ঘটনা দেখতে পেয়ে দুনিয়ার মানুষকে শেখাতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার ঘটনাকে। বন্ধুরা, অনেকে ভাবতেই পারো যে গ্যালিলিও যদি সত্যি ঘটনাটা না আবিষ্কার করতেন, তাহলে কি সত্যি মিথ্যে হয়ে যেত! তা যখন হতই না তাহলে আলাদা করে এই আবিষ্কারের গুরুত্বটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত থাক শিকেয় তোলা। তোমাদের হীরক রাজার দেশে'র সেই গবেষকের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। তার একটা দূরবীন যন্ত্র ছিল যাতে যোজন দূরের বস্তু চলে আসত দুই হাত কাছে। তাহলে খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাই না তাকে দৃশ্যমান করতেই বায়নোকুলার, টেলিস্কোপ কিংবা মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন। মানুষের চোখ যা করতে পারছে না, তা সম্ভব হচ্ছে যন্ত্রের দ্বারা। চোখের মণি আসলে একটি লেন্স। যার মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে প্রতিবিম্ব গঠন করলে আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই। তাই চোখ দেখাতে পারছে না মানে হ'ল লেন্সটি ততটা জোরালো নয়। এই ঘাটতিই আসলে মেটে দূরবীন কিংবা মাইক্রোস্কোপের জোরালো লেন্সের মাধ্যমে। জোরালো লেন্সের দ্বারা যেমন দৃশ্যমান বস্তুকে আরো বড় করে দেখা যায়, তেমনি খালি চোখের বহু অদৃশ্য বস্তুও নতুন করে দৃশ্যমান হয়।

বর্তমানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে কোনো লেন্স-এর সাহায্য ছাড়াই বিশ্বব্রহ্মান্ডে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনাকে বহুগুণে বড় করে ঘটনাটির বিশেষ বিশেষ অদৃশ্য দিকগুলো দেখার সুযোগ করে দিল নতুন আবিষ্কৃত এক যুগান্তকারী পদ্ধতি যার নাম **Eulerian Video বৃহত্তরীকরণ** (Eulerian Video Magnification)। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বহু এমন ঘটনা থাকে সেগুলো হয়তো আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা ঠিকই, তবে এই ঘটনাগুলো ঘটার ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তা বহুক্ষেত্রে তার বাহ্যিক রং, গতি, অবস্থানের পরিবর্তন করে দেয়। এই পরিবর্তনকে খালি চোখে কেন মাইক্রোস্কোপ লাগিয়েও ধরা যায় না, কারণ তাতে নির্দিষ্ট একটি সামান্য অংশকে বড় করে ধরা হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর এই অতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনকে ধরতে গেলে একদিকে যেমন পরিবর্তিত অংশগুলিকে বড় করতে হয়, তেমনি পুরো বস্তুটির সাপেক্ষে ঐ অংশটির পরিবর্তনকে আগে ও পরে মিলিয়ে দেখতে হয়। তা নাহলে এই পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এই ব্যাপারটা আবার হয় সম্পূর্ণ কম্পিউটারে একাধিক ধাপে গোটা ভিডিওটির বৃহত্তরীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এটি অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। যদি কেউ নিখুঁতভাবে এর পদ্ধতিগত জটিলতাকে বুঝতে চান, তবে তাকে www.youtube.com-এ গিয়ে বিষয়টি লিখতে হবে। এছাড়া www.google.com-এও এ বিষয় সম্পর্কিত বহু লেখা পাওয়া যাবে।

এবার আসা যাক পদ্ধতিটির বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। উদাহরণ সমেত বললে হয়তো পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হবে। তাই একটি নমুনা নেওয়া যাক। শরীরে রক্ত প্রবাহের সময় অনবরত ত্বকের রঙের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক পদ্ধতিতে হৃদপিন্ড যে গতিতে ধমনীতে রক্ত নিক্ষেপ করে, রক্তের সেই গতির কারণে উপরি ত্বকেরও রঙ পরিবর্তিত হয় যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব। যদি কোনো ব্যক্তির মুখের একটি ভিডিও তুলে নেওয়া যায় তাহলে সেই ভিডিও থেকেই এই পদ্ধতি অনুসারে তার ত্বকীয় রঙের অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন দেখে বলে দেওয়া যাবে হৃদপিন্ড কি হারে রক্তপ্রবাহ করছে শরীরে। অর্থাৎ হৃদকম্পনকে সূক্ষ্মভাবে মেপে ফেলা যাবে যা সাধারণভাবে করতে গেলে হয়তো স্টেথোস্কোপের প্রয়োজন পড়ত। তবুও তার মধ্যে সূক্ষ্মতার অভাব থাকতো। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিডিওটিকে প্রথমে স্পেসিয়াল ডিকম্পোজিশন ও তারপর টেম্পোরাল ফিল্টারিং করা হয়। সবশেষে আউটপুট ভিডিওটিকে মূল ভিডিও'র সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভিডিও'র বাকি অংশের অপরিবর্তনের সাপেক্ষে বৃহত্তরীকৃত অংশের পরিবর্তন আরোও ভালোভাবে বোঝা যায়।

পৃথিবীর সমস্ত ধরনের অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনকে দৃশ্যমান করা ও সেখান থেকে নতুন তথ্য বের করে আনা – এটিই **Eulerian Video বৃহত্তরীকরণ** প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। বাস্তব

জীবনে এর প্রয়োগ বহুবিধ।

(১) যেমন ধরুন কারোর শরীরের রক্তে যদি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে রক্তের লাল ভাব কমে যাবে। যা তার ত্বককে ফ্যাকাসে করে তুলবে। প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো এই ফ্যাকাসে রংকে খালি চোখে ধরা নাও যেতে পারে। কোনো জটিল রোগের কারণে যদি এই ঘটনা ঘটে তবে তা খালি চোখে ধরা পড়তে পড়তে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেও যেতে পারে। ইউলেরিয়ান বৃহত্তরীকরণের মাধ্যমে এই অ্যানিমিয়াকে বহু আগেই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব ত্বকীয় রঙের পরিবর্তন দেখে। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ নিখুঁতভাবে করা সম্ভব যেগুলো বর্তমানে আলাদা আলাদাভাবে করতে গেলে হয়তো বহু যন্ত্রীয় পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে।

(২) আমরা জানি লাই ডিটেক্টর বা মিথ্যে কথা ধরে ফেলার যন্ত্রের কথা। শুধু পুলিশী ক্ষেত্রেই নয় বহু জটিল মনোগত রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা এর ব্যবহার করে থাকেন। অপরাধী বা রোগীকে বহু তার জালিকা ধারণ করতে হয় যার মধ্যে দিয়ে তার শরীরের সাথে যন্ত্রটি সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত ঝামেলাই মিটে যেতে পারে এক দফায় এই ইউলেরিয়ান বৃহত্তরীকরণ প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে। কেউ যখন মিথ্যে কথা বলে তখন সেই মিথ্যেকে ঢাকতে আবার তাকে বহু মিথ্যে বলতে হয়। এর ফলে তার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপ আসলে তার শরীরের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহকে ব্যাহত করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে আকস্মিক সূক্ষ্ম কম্পন ধরা পড়ে। ব্যক্তিটির মুখের ভিডিও তুলে এই পদ্ধতিতে তাকে বৃহৎ করলে তা অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে গিয়ে এই রক্তপ্রবাহের আকস্মিকতাকে সূচিত করতে পারে। একই কাজ বর্তমানে লাই ডিটেক্টর যন্ত্র করলেও তার সূক্ষ্মতার পর্যায় ইউলেরিয়ান বৃহত্তরীকরণের তুলনায় বহুগুণে কম থাকে।

(৩) সৌর মন্ডলে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের গতি-অবস্থান ইত্যাদিও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যাবে স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে তোলা ভিডিওটিকে বৃহত্তরীকরণের মধ্য দিয়ে। এমনকি প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহে ঘটমান অন্তবর্তী প্রক্রিয়াকেও সুনির্দিষ্টভাবে ধরে ফেলা যাবে এর মাধ্যমে।

(৪) পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে বরফের গলনের হারের পরিবর্তন যা কিনা খালি চোখে কেন বেশ কয়েক বছরেও নির্ণয় করা অসম্ভব তাকেও একবারে নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে পর্যবেক্ষণ প্রমাণের মাধ্যমে (অবজারভেটরি এভিডেন্স)। এইরকম জাগতিক প্রায় সমস্ত অদৃশ্য ঘটনার সূক্ষ্মতার হদিশ মিলতে পারে নতুন আবিষ্কৃত এই ভিডিও বৃহত্তরীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এর জন্য, বানাতে হচ্ছে না কোনো জোরালে দূরবীন, প্রয়োজন হচ্ছে না কোনো যন্ত্রীয় পরিকাঠামোর। ক্যামেরা, মোবাইল ক্যামেরা বা ওয়েবক্যামেরায় তোলা ভিডিওকেও এই পদ্ধতিতে নেওয়া যেতে পারে। তাতে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি হবে না। আর যে ছবি মানুষ তুলতে পারে না, সে ছবি তুলবে স্যাটেলাইট।

এখানেই আলোচনা শেষ নয়। গোটা ব্যাপারটির আরো একটি দিক আছে। প্রকৃতির নিয়মকে মানুষ আবিষ্কার করে ঠিকই, তবে তা সত্যিকারের নির্ভুল তত্ত্বে পরিণত হয় উপযুক্ত দৃশ্যমান প্রমাণ পেলে তবেই। গ্যালিলিও'র ধারণাটি যেমন তার শক্তিশালী টেলিস্কোপ যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়ে তত্ত্বে পরিণত হয়েছিল, তেমনই। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে সমাজজীবনে প্রয়োগ করতে গিয়েই মানুষ প্রয়োগ জাত বা প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়। ইউলেরিয়ান ভিডিও বৃহত্তরীকরণ এমনই প্রযুক্তির একটি যুগান্তকারী নমুনা। আবার ভেবে দেখুন, এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন শাখার বহু বৈজ্ঞানিক ধারণা সত্যতার মজবুত দৃশ্যমান প্রমাণ পাবে। যা নতুন বিজ্ঞানকে তুলে ধরবে আমাদের সামনে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আন্তসম্পর্কটি এমনই। আর বিজ্ঞানীদের কাজ বিজ্ঞানকে আবিষ্কার করা প্রয়োগের স্বার্থে, তা না হলে সমাজ তার সুফল ভোগ করকে কি করে? প্রকৃতির নিয়মকে জেনে মানবসমাজে প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত করা যেহেতু একটি প্রগতিশীল কাজ তাই বন্ধুরা, তোমাদের কাছে একদম শুরুতে রাখা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও'র আবিষ্কারের তাৎপর্যটিও ঠিক এখানেই।

ইউলেরিয়ান ভিডিও বৃহত্তরীকরণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার হলেও একে সেসব ক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রয়োগ না করলে কিন্তু মানবসমাজেরও উন্নতি ঘটবে না এবং সমগ্র বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলাও ব্যাহত হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার যারা চালক অর্থাৎ মালিকশ্রেণী তারা বিজ্ঞান সাধনাকেও আজ কুক্ষিগত করে রেখেছে লাভের ক্ষেত্রগুলিতে। যেসমস্ত বিজ্ঞানের শাখার বিকাশে তাৎক্ষণিক কোনো লাভের রাস্তা নেই, তা নিয়ে বর্তমানে রিসার্চের সুযোগও নেই। আর প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের সুফলগুলো তারাই ভোগ করতে পারে যাদের ততোধিক পয়সা আছে। তাই পাঠকবন্ধুরা যতই আপনাদের কাছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির নমুনা বিশেষ তুলে ধরি, সবশেষে একটা প্রশ্নই রাখতে চাই – মালিকশ্রেণীর মুনাফা রাজ খতম না হলে আমাদের-আপনাদের মতো আমজনতা কি প্রযুক্তির সেই সুবিধা পাবে নাকি তা দিয়ে বিজ্ঞানের সার্বিক উন্নতি হবে? ■

নাইট্রোজেন চিহ্নিতকরণ ঃ বেশি ফলন, কম দূষণ

উদ্ভিদ জগতে নাইট্রোজেনের ভূমিকা অসামান্য। ডিএনএ, উৎসেচক, প্রোটিনসহ, আরো অনেক জৈব যৌগে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি অনিবার্য। উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটি থেকে নাইট্রোজেন নাইট্রেট যৌগ হিসেবে শোষণের পর পেয়ে থাকে। কেবল শিম্ব গোত্রীয় কিছু উদ্ভিদের মূলে অবস্থিত বিশেষ কিছু অর্বুদের নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাক্টেরিয়া সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে গাছকে সাহায্য করে। বেশি বেশি ফসল পাওয়ার জন্য মাটিতে তাই প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট সার দিতে হয়। তাতে মাটি, জল, বাতাস নাইট্রোজেন ঘটিত দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। গাছের কতটা নাইট্রোজেন লাগবে আর মাটিতেই বা কী পরিমাণ নাইট্রেট সার ঢালতে হবে তার সঠিক মাত্রা আজও ঠিক ঠিক জানা হয়নি। মানা হয়নি। তাই বাড়ছে সমস্যা।

কার্নেগী ইনস্টিটিউশান অব সায়েন্সের বিজ্ঞানী চেং সুন হো ও তাঁর দল এমন এক "নাইট্রিক সেন্সর" (The Ni Trac Sensor) বানিয়েছেন যার দ্বারা জানা যাবে কোন্ ফসলে কতটা নাইট্রোজেন প্রয়োজন। উদ্ভিদের মূলে যন্ত্রের সেন্সর স্পর্শ করলেই ডিজিটাল মাত্রায় জানা যাবে ঐ উদ্ভিদে নাইট্রোজেন ট্রান্সপোর্ট রেইট কি বা কত। যন্ত্রের মূল বিষয়টি ন্যানোটেক প্রযুক্তিতে কোষের ডিএনএ-তে ফ্ল্যারোসেন্ট ট্যাগিং মার্কার ব্যবহার করে নাইট্রোজেন ট্রান্সপোর্ট রেইট মাপাহয়। নাইট্রেক সেন্সর সংক্রান্ত গবেষণা পত্রটি ১১ মার্চের 'ইলাইফ' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এই যন্ত্রের দ্বারা উপকৃত হবেন চাষীগণ, বাঁচবে পরিবেশ, হবে অর্থনৈতিক সাশ্রয়।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, শুধু উদ্ভিদে কেন এই সেন্সর যন্ত্র প্রাণীদেহেও বসিয়ে মুহূর্তে হিসেব পাওয়া যাবে সংবাহিত নাইট্রোজেন যৌগের গতি প্রকৃতি। বেরিয়ে আসবে রোগ নির্ণয়ের নয়া কৌশল।■

আধা কৃত্রিম জীব সৃষ্টি!

নিত্যদিন নতুন নতুন আবিষ্কার দিয়ে পুরোনোকে ছাপিয়ে যাওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, নতুন উচ্চতার কীর্তি রচনা যদি বিজ্ঞানের মন্ত্র হয় তবে সাম্প্রতিক 'নেচার' জার্নালের ৭ই মে সংখ্যায় প্রকাশিত ফ্লয়েড. ই. রোম্‌সবার্গ (Fleyed E. Romesberg) এর নেতৃত্বে, তার বিভিন্ন দেশের ৭ জন সাথীর গবেষণাপত্র যে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ক্ষুদ্র এককোষী জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত জীবনকে এবং তার সর্ব ধর্মকে যে কোষের ডিএনএ গঠনের মধ্যেকার দুই জোড়া 'বেস' (A-T এবং G-C) সমন্বিত জিনোম দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায় এটা আজ আমাদের সকলেরই জানা। আদিজীবন সৃষ্টির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, থাইমিন – এই চারটি নিওক্লিওটাইড বেসের জোড়গুলি ক্রমাগত প্রতিলিপি তৈরী করে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি, পরিণামে নতুন জীব সৃষ্টি করে চলে অথবা শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে বিভিন্ন উপাদান তৈরী করে বলে বিজ্ঞানীরা এতোকাল ব্যাখ্যা করে এসেছেন। কিন্তু যদি এই চারটি বেস ছাড়াও নতুন বেস জোড় কৃত্রিমভাবে (অর্থাৎ মানুষের দ্বারা) তৈরী করা যায় এবং ডিএনএ'র ভিতরে অবস্থিত চারটি বেসের শৃঙ্খলের সঙ্গে এদের যুক্ত করা যায় এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় এমন নতুন জীব যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে কোনো দিনও ছিল না? ঠিক এই এযাবত অসাধ্য কাজটিকে বাস্তবে করে দেখিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলা (La Jolla)-তে অবস্থিত স্ক্রিপস রিসার্চ ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানী দল (Scripps Research Institute)। এই আনন্যাচারাল বেস পেয়ারের নিওক্লিওটাইডগুলির সহজ নাম দেওয়া হয়েছে X এবং Y। যদিও এদের জটিল রাসায়নিক গঠনগুলি আসলে d 5 SICS এবং d 5SICS-d Na M। এই কৃত্রিম নিওক্লিওটাইডগুলি তৈরী করার পর ইষ্টিরিজিয়া কোলি (E. Coli) নামক ব্যাকটেরিয়ার দেহে চালান করে ব্যাকটেরিয়াটির স্বাভাবিক নিওক্লিয়টাইডের শৃঙ্খলের সঙ্গে এদের যোগ করে দিয়ে যে উপাদানগুলি কৃত্রিম বেসগুলির উপাদান সেগুলি কোষের ভেতরে সরবরাহ করে যে পলিমারেজ উৎসেচক ডিএনএ প্রতিলিপি গঠনের জন্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করে দেবার পরই ঘটে গেছে প্রত্যাশিত ঘটনাটি। আধা প্রাকৃতিক আধা কৃত্রিম বেস সম্বলিত নতুন জীবটির বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কৃত্রিম জীবনের 'সৃষ্টি কর্তা' হিসেবে মানুষ তার সাক্ষর রেখেছে। প্রতিটি আবিষ্কারের শেষ ফল তখনই মানুষের পক্ষে আসে যখন গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে মানবকল্যাণ। সেই অবস্থাটা যতদিন না নিশ্চিত হচ্ছে ততদিন যে কোনো আবিষ্কার মানুষের স্বার্থে প্রযুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন তাদের সৃষ্ট জীবটি মানুষকে সংক্রেমিত করতে পারবে না।■

নিউট্রন স্টার ও তার সঙ্গী হীরের টুকরো

গত ২৩শে জুন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আমেরিকার উইসকনসিন মিল ওয়াকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা শ্বেত

বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ-এর সন্ধান পেয়েছেন বলে জানানো হয়। কি এই শ্বেত বামন? সূর্যের মতো আকারের ও মাপের নক্ষত্রদের অন্তিম পরিণতিকে বিজ্ঞানীরা বলেন শ্বেত বামন। এই সকল নক্ষত্রগুলির জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে প্রবল অভিকর্ষজনিত চাপের জন্য নক্ষত্রের বিশাল আকার সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় পৃথিবীর মতো হয়ে আসে এর ফলে এদের ঘনত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ আর তারপরে ধীরে ধীরে এই কয়েক কোটি বছর কাটিয়ে অবশেষে নক্ষত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়। উইসকনসিন মিলওয়াকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে এই শ্বেত বামনটিকে পর্যবেক্ষণ করে নি বরঞ্চ পি এস আর জে ২২২২-০১৩৭ নামক এক নিউট্রন স্টারের উপরেই প্রথমে নজর যায়, এখন কি এই নিউট্রন স্টার? সূর্যের চাইতে ৪ থেকে ৮ গুণ বড় মাপের কোনও নক্ষত্রের যখন তার অন্তিম পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে তখন তাকে নিউট্রন স্টার বলে। বিশাল আকারের এই নক্ষত্রগুলির যখন জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তখন এই নক্ষত্রগুলিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে যাকে বলে 'সুপারনোভা'। নক্ষত্রগুলি বাইরের স্তরে ঘটে যাওয়া এই বিস্ফোরণ খুব সুন্দর এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটায়। আর এই সময়ে নক্ষত্রগুলির ভেতরের অংশটি প্রবল অভিকর্ষজনিত চাপের জন্য সংকুচিত হয়ে যায় এবং প্রায় ২০ কিমি ব্যাসের ও সূর্যের চাইতে ১.৪ গুণ ভরে পরিণত হয়ে যায়, এর ফলে এর ঘনত্ব দারুন বেড়ে যায়, আর এই নিউট্রন স্টারই যখন আপন কক্ষে ঘুরতে থাকে ও তার অভ্যন্তরীন কণাগুলি প্রায় আলোর গতিতে ঘুরতে থাকে লাইট হাউসের মতো তরঙ্গ বিকিরণ করতে থাকে তখন তাকে 'পালসার' স্টার বলে। মিলওয়াকি-উইসকনসিনের বিজ্ঞানীরা এইরকমই একটি পালসার স্টারকে লক্ষ করতে গিয়ে দেখেন ওই শ্বেত বামনটিকে। শ্বেত বামনটির তাপমাত্রা এতটাই কমে যায় যে ওখানে কার্বন জমে কেলাসে পরিণত হয়েছে আর গোটা নক্ষত্রটাই একটি হীরের আকার ধারণ করেছে, আর পালসার স্টারের সঙ্গী হিসাবে তার থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গকে হীরের ন্যায় বিচ্ছুরিত করছে আর তার ফলেই বিজ্ঞানীদের নজরে আসে নিউট্রন স্টার ও তার সঙ্গী এই হীরের টুকরোটি। ■

৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবী থেকে ১৭ গুণ ভারী কঠিন গ্রহের আবিষ্কার

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবী থেকে প্রায় ১৭ গুণ ভারী, কঠিন পাথুরে একটি গ্রহের প্রমাণ মিলেছে যা ৫৬০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীরা এই গ্রহটির নাম দিয়েছেন কেপলার ১০ সি। এই গ্রহটি তার নক্ষত্রকে (পৃথিবীর যেমন সূর্য) একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় মাত্র ৪৫ দিন। এই গ্রহটির আবার তিনটি লাভাজাত উপগ্রহ আছে, যার একটির নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার ১০ বি, যা অতি দ্রুত কেপলার ১০ সি গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করে মাত্র ২০ ঘন্টায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগে মনে করতেন যে এত ভারী এবং বড় পাথুরে গ্রহ মহাবিশ্বে থাকা সম্ভব নয়। কারণ সূর্যের গ্রহ বৃহস্পতির মত বৃহৎ গ্রহ সৃষ্টির সময় মহাবিশ্ব থেকে প্রচুর হাইড্রোজেন গ্যাস তাতে সমন্বিত হয়ে যায়। ফলে বৃহৎ গ্রহগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা অতিরিক্তভাবে পূর্ণ থাকে এবং যার বড় অংশ গ্যাসীয় হয়।

বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্রহটি পুরোটাই কঠিন এবং অতীতে আবিষ্কৃত বিশাল কঠিন (সলিড) গ্রহগুলির তুলনায় অনেক বড় এবং ভারী। হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেভিয়ার ডুমুস্ক উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেন যে আমরা যখন এই গ্রহটি খুঁজে পেলাম তখন আমরা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। এটাকে পৃথিবীর গডজিলা (বিশাল দৈত্য) বলা যায়। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে এই দৈত্যাকৃতির কেপলার ১০ সি গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। ■

[তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ৪.৬.১৪]

গবেষণাগারে জিন পরিবর্তিত মশা তৈরী করে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ!

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা গত ১১ই জুন ২০১৪ ঘোষণা করেছেন যে জিন পরিবর্তিত মশা গবেষণাগারে তৈরী করে আগামীদিনে পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়ার মত রোগ নির্মূল করা সম্ভব।

কীভাবে এটা সম্ভব? লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে গবেষণাগারে এমন মশা তৈরী (জিন পরিবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে) করা সম্ভব যাদের অপত্যের ৯৫ শতাংশ হবে পুরুষ মশা এবং ৫ শতাংশ হবে স্ত্রী মশা। এই জিন পরিবর্তিত মশা অ্যানোফিলিস গ্যামবাইন মশার স্ত্রী/ পুরুষের অনুপাত ক্রমশঃ কমিয়ে আনবে। যেহেতু এই অ্যানোফিলিস স্ত্রী মশার দংশনে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু (প্লাসমোডিয়াম ভাইভক্স এবং প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম) ছড়িয়ে পড়ে, তাই স্ত্রী মশার হার কমাতে কমাতে শূন্যে নিয়ে যেতে পারলে ৬টি প্রজন্মের পর ম্যালেরিয়ার বাহক মশা নির্মূল হয়ে যাবে। কীভাবে এটা সম্ভব?

জিন পরিবর্তিত পুরুষ মশা অ্যানোফিলিস স্ত্রী মশার সাথে মিলনে যে অপত্য সৃষ্টি করবে প্রথম প্রজন্মের অপত্যের ক্ষেত্রে তা পুরুষ/স্ত্রী মশার অনুপাত ৯৫:৫-এ নামিয়ে আনবে। এইভাবে প্রতিটি প্রজন্মে স্ত্রী মশার অনুপাত কমবে এবং ৬টি প্রজন্মের পর স্ত্রী মশা কার্যতঃ নির্মূল হয়ে গেলে একদিকে যেমন ম্যালেরিয়ার বাহক নির্মূল হবে তেমনি স্ত্রী মশা না থাকায় মশার এই প্রজাতিটাই ধ্বংস হবে। [তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১.৬.১৪]

এই গবেষণার প্রয়োগ মানব সমাজের উপকার অবশ্যই করবে কিন্তু এই গবেষণার তথ্য সামনে আসায় অনেক পুরানো বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নানা মহলে অভিযোগ ছিল যে গবেষণাগারে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনসেফালাইটিস, ফাইলেরিয়া ইত্যাদির বাহক মশার কৃত্রিম মিউটেশন ঘটিয়ে নতুন মশা তৈরী করে সাম্রাজ্যবাদীরা কি একে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন হিসাবে ব্যবহার করছে? এইসব রোগবাহক মশার নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে এই অসুখগুলিকে আরও বিস্তার ঘটানো হচ্ছে? অসুখগুলির বিস্তার ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসার প্রসার ঘটানো হচ্ছে?

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। এই সন্দেহগুলিকে আদৌ অমূলক বলা যায় না। আজ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত গবেষণাগুলি একচেটিয়া পুঁজি সংস্থাগুলির অধীনে। গবেষণাগুলিতে গবেষকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় না, প্রতিফলিত হয় গবেষণা যারা চালায় তাদের স্বার্থ। একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী তথা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ একটাই – বিশ্বের সমস্ত বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব বজায় রেখে মুনাফা–অতিমুনাফা চালিয়ে যাওয়া। এই স্বার্থ সিদ্ধি করতে মানবসমাজ, জীবজগৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে, তাদের অপ্রয়োজনীয় অংশ ধ্বংস করতে, তাদের কাছে বেশি মুনাফাদায়ী কিছু সৃষ্টি করতে, তারা পিছপা অতীত দিনেও হয়নি, আগামী দিনেও হবে না।

মানবসমাজ যতদিন না এই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর হাত থেকে মুক্ত হবে ততদিন বিজ্ঞানের গবেষণা সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে না।■

তিন পিতা-মাতার জিন পরিবর্তিত মনুষ্য ভ্রূণের জন্মদান সম্ভব

যে বাবা-মায়েরা তাদের জিনগত ত্রুটি সন্তানের শরীরে সঞ্চালিত করে তাকে অসুস্থ করতে চান না তাদের জন্য “তিন পিতা মাতা”র আই ভি এফ (invitro fertilisation) প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে ২ বছর পর সন্তানের জন্ম দেওয়া যেতে পারে বলে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। এই গবেষণা এখন চলছে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে এবং এখনও পর্যন্ত এই গবেষণা কোনও মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি।

ব্রিটেনে এই পদ্ধতি এখনও বেআইনী। কিন্তু গতবছর সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা একটি খসড়া বিল তৈরী করছে যা আগামী দিনে সংসদের পাশ করানো হবে। এই আইন পাশ হলে যে দম্পতিদের জিনগত অসুখ আছে তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্য এক মহিলা দাতার সাহায্যে সুস্থ সন্তানের পিতামাতা হতে পারবে।

এই প্রযুক্তির মূল বিষয়টি হল কোষের মাইটোকনড্রিয়ার পরিবর্তন যা স্বামী-স্ত্রী’র স্পার্ম এবং ওভামের ফার্টিলাইজেশনের সময় ত্রুটিযুক্ত মাইটোকনড্রিয়ার ডিএনএগুলি সরিয়ে অন্য এক মহিলার ওভামের ত্রটিহীন সেই সেই মাইটোকনড্রিয়ার ডিএনএগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে জাইগোটের জন্ম দেবে। এই জাইগোট প্রথম মায়ের শরীরে প্রতিস্থাপন করে তার গর্ভে এই ভ্রূণ লালিত পালিত হয়ে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেবে। এই প্রক্রিয়ায় হার্ট, যকৃত, মস্তিষ্কের সমস্যা, অন্ধত্ব, পেশীগত ত্রুটিমুক্ত সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতি অবলম্বন না করলে বাবা-মায়ের সন্তান যেসব শারিরীক ত্রুটি নিয়ে জন্মাত, পদ্ধতির ব্যবহারে তা দূর হবে।

গত ২রা জুন ২০১৪ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে যে এই পদ্ধতি আদৌ বিপজ্জনক নয় বরং বিশেষ একগোষ্ঠী রোগীর ক্ষেত্রে উপকারী।■

চোখের প্রেসার এবং অন্যান্য অসুবিধা চিহ্নিতকরণ করা যাবে চোখে বসানো সেনসর মনিটরের সাহায্যে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি লো পাওয়ার সেনসর প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন। এই লো-পাওয়ার আই সেনসরটি কোনও মানুষের চোখে স্থায়ীভাবে বসানো যাবে। যার সাহায্যে চোখের প্রেসার সহজে মাপা যাবে। এই সেনসরটি একটি কৃত্রিম লেনস-এর সাহায্যে চোখের ক্যাটারাক (ছানি) অপারেশনের সময় বসিয়ে দেওয়া যাবে। এই সেনসর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখের প্রেসারের পরিবর্তন চিহ্নিত করতে

পারবে এবং অতিদ্রুত সেই তথ্য পৌঁছে দেবে ওয়ারলেস ব্যবস্থার সাহায্যে একপ্রকার রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে। এর ফলে ওই মানুষটির চোখ একটি উচ্চ প্রযুক্তির ইনফরমেশন সেন্টার হয়ে উঠবে এবং তথ্যগুলি চোখের ডাক্তারকে জানালে উনি চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবেন। [টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৮.৬.১৪]

স্মার্ট গ্লাসের সাহায্যে প্রায়-অন্ধ মানুষও তুলনায় ভাল দেখতে পাবেন

লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি উন্নত প্রযুক্তির চশমা আবিষ্কার করেছেন। এই চশমার সাহায্যে চোখে প্রায় দেখতেই পান না বা প্রায়-অন্ধ মানুষদের তুলনায় ভাল দেখার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন। এই গবেষকদের টিমের প্রধান স্টিফেন হিকস মন্তব্য করেন "এই স্মার্ট গ্লাস আবিষ্কারের উদ্দেশ্য সেই মানুষদের আবার তুলনায় ভাল দেখতে সাহায্য করা যারা প্রায় দেখতেই পান না।"

এই স্মার্ট গ্লাসের (চশমা) সাথে থাকবে একটি ভিডিও ক্যামেরা যা কিনা চশমার ফ্রেমের সাথেই লাগানো থাকবে। এর সাথে থাকবে একটি ছোট কম্পিউটার প্রসেসিং ইউনিট যা চশমা ধারকের পকেটে বা ব্যাগে রাখা যাবে। এর মধ্যে থাকবে একটি সফটওয়্যার যা দৃশ্যগুলি এই চশমার সাহায্যে তার ধারকদের দেখাতে সাহায্য করবে। চশমার কাঁচে স্বচ্ছ ইলকট্রনিক ডিসপ্লে ব্যবস্থা থাকবে যার সাহায্যে তিনি দৃশ্য আগের চাইতে অনেক ভাল দেখতে পাবেন।■ [টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১৮.৬.১৪]

নতুন মাইক্রোওয়েভ হেলমেট শরীরে স্ট্রোক ও রক্তসঞ্চালন ধরতে পারবে

সুইডেনের চালমার্স ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, সালগ্রেনস্কা অ্যাকাডেমি এবং সালগ্রেনস্কা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা একটি হেলমেট আবিষ্কার করেছেন যা রোগীর মাথায় পড়িয়ে দিলে ব্রেন-এর (মস্তিষ্ক) কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাবে। এই হেলমেট ব্রেন থেকে নির্গত মাইক্রোওয়েভ (সূক্ষ্ম তরঙ্গ) নির্ণয় করে যে ব্রেনে কোথাও রক্ত জমাট বেধে আছে কিনা, কোথাও রক্তপাত (ইন্টারনাল হ্যামারেজ) হচ্ছে কিনা।

এই হেলমেটের সাথে একটি মাইক্রোওয়েভ সিগনাল ব্যবস্থা থাকবে যা থেকে ব্রেনের কার্যকারিতার ছবি ফুটে উঠবে। অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই গোটা ব্যবস্থাটি ফিট করা থাকবে এবং রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার ব্রেনের সমগ্র চিত্র, কোনও স্ট্রোক হয়েছে কিনা, কোনও ব্লাড ভেসেল দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে কিনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় চিত্রে ফুটে উঠবে এবং ডাক্তাররা রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তা হাতে পেয়ে যাবেন।

এই নতুন হেলমেট রোগীর ডায়াগনোসিস এবং স্ট্রোক ইত্যাদির চিকিৎসাকে এবং রোগীকে সারিয়ে তুলতে এক অতি উন্নত ব্যবস্থাপনা।■ [বিবিসি নিউজ]

সৈনিকদের মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য এসি হেলমেট আবিষ্কার

২০১৩ সালে এডগেউড কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল সেন্টার, যা কিনা ইউ এস আর্মি রিসার্চ ডেভলপমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমান্ড-এর একটি অংশ, সৈনিকদের অত্যধিক গরমে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য এয়ার কন্ডিশানিং (বাতানুকূল) হেলমেট ডিজাইন করার কাজ শুরু করে।

সম্প্রতি সেই গবেষণা সমাপ্ত হয়েছে এবং আগামী প্রজন্মের মার্কিন সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচন্ড গরমেও এই হেলমেট পড়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন।

এই ক্ষেত্রে যোদ্ধাদের শরীরে বিদুৎ সংযোগের ব্যবস্থাপনাসহ এয়ার পিউরিফাইং রেসপিরেটর থাকবে। যার সাথে থাকবে হোস পাইপ যা মাস্কের মধ্যে দিয়ে মুখের সাথে জোরা থাকবে এবং থাকবে একটি ব্লোয়ার ইউনিট এবং ব্যাটারি। এই ব্যাটারি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সৈনিকের কোমরের বেল্টে বা পিঠে বাঁধা থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়ার দক্ষিণাংশের প্রচন্ড গরমে যুদ্ধ করতে গিয়ে মার্কিন সেনারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই সে দেশের সৈনিক ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বারে বারে যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ উঠছে। গোটা দুনিয়ার উপর সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সৈনিকদের 'ঠান্ডা রাখতে' সে দেশের আর্মি এই ব্যবস্থা নিতে চলেছে।■ [টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২১.৫.১৪]

(*বিজ্ঞানের আরও খবর দেখুন ৩৫ পৃষ্ঠায়*)

চিঠিপত্র ঃ

মাননীয় সম্পাদক,

আমি 'সমীক্ষণ' প্রকাশের প্রথম থেকেই সমীক্ষণের নিয়মিত পাঠক। সমীক্ষণের প্রতিটি 'এডিশন' আমি পড়েছি। সমীক্ষণ-এর শেষ যে সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ চতুর্থ বর্ষ, সংখ্যা ১ সম্বন্ধে আমার কিছু মতামত ও প্রশ্ন আছে।

মতামত ১ – পৃষ্ঠা ৫-এর শীর্ষকে 'লাভপুরের মধ্যযুগীয় বর্বরতা ব্যাতিক্রম নয়' – এখানে 'ব্যাতিক্রম' বানানটি-র সংশোধন প্রয়োজন, বানানটি হবে 'ব্যতিক্রম'।

মতামত ২ – আপনাদের বেশ কয়েকটি লেখায় কোনও লেখকের নাম থাকে না। যদি লেখাটি পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর লেখা হয় তবে তাতে অন্ততপক্ষে যদি 'সম্পাদকমন্ডলী' লেখা হয় তাহলে রচনা বা লেখাগুলির লেখক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা করা যায়।

প্রশ্ন ১ – 'ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা' প্রসঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা হলো – যে কোন স্বপ্নে আমরা স্বপ্নে-র মধ্যে কথোপকথন শুনতে পাই, তাহলে যারা 'বোবা ও কালা' কিন্তু অন্ধ নয় তারা কি স্বপ্ন দেখে?

প্রশ্ন ২ – পৃষ্ঠা ৩০, 'যে প্রগতিশীল সংস্কৃতি ধর্ষণকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় ঘোষণা করেছে, সেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির মানুষ কি প্রাণী জগতে সমকামিতার উদাহরণকে খাড়া করে সমকামিতাকে যৌন বৈচিত্র আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে সমকামী যৌন সম্পর্ককে মান্যতা দিতে পারে?' – এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো ধর্ষণ ও সমকামিতাকে কি প্রগতিশীল সমাজে একই পংক্তিতে ফেলা যায়, কারণ ধর্ষণে একজন মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটানো হয় অপরপক্ষে সমকামিতায় উভয়পক্ষই সম্মতি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ৩ – পৃষ্ঠা ৩৪ 'অথচ অতীতের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া গণতান্ত্রিক চীনের লাল ফৌজের মধ্যে সমকামিতার কোনও নজির পাওয়া যায় না' – এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হলো 'সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন' বা 'নয়াগণতান্ত্রিক চীন' উভয় দেশেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা হতো আর তাই বহির্বিশ্বে এই দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে খবর পাওয়া যেত না তাই এই দুই দেশের সেনাবাহিনীতে সমকামিতা ছিলো কি ছিলো না তার সম্বন্ধে কি করে এতটা নিশ্চিত হওয়া যায়?

প্রলয় মুখার্জি
ডায়মন্ড পার্ক, জোকা
কোলকাতা ১০৪

মাননীয় পাঠক,

সমীক্ষণের নিয়মিত পাঠক হওয়া ও সমীক্ষণকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য আপনি যে মহামূল্যবান চিঠিটি দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রথমে আসি আপনার মতামত বিষয়ে –

মতামত ১ – 'ব্যতিক্রম' বানানটি সম্বন্ধে আপনার মতামত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ও ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করবো বানানের ব্যাপারে আরও যত্নশীল হতে।

মতামত ২ – সমীক্ষণের রচনাগুলি কোনও ব্যক্তিসদস্য, পাঠক যেমন পাঠান তেমনই সংগঠনের পক্ষ থেকে পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীও তা রচনা করে। ব্যক্তিগতভাবে যারা রচনা, চিঠিপত্র পাঠান তাঁদের রচনা তাঁদের নামেই প্রকাশ করা হয় আর সম্পাদকমন্ডলীর দ্বারা রচিত রচনা বিনা নামে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে রচনার পাশে সম্পাদকমন্ডলী লেখাটা আমরা বাহুল্য মনে করি।

উত্তর ১ – 'বোবা-কালা' মানুষেরাও স্বপ্ন দেখতে পারে কারণ তাদের তো দৃষ্টি আছে ফলে তারা অবশ্যই স্বপ্ন দেখে যদিও তাদের স্বপ্ন হবে নির্বাক। একজন দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ যে যে কারণের জন্য স্বপ্ন দেখে একজন বোবা-কালা মানুষও সেই একই কারণে স্বপ্ন দেখতে পারে।

উত্তর ২ – সমকামিতা ও ধর্ষণ যখন যৌনতায় অংশগ্রহণের নিরিখে বিচার করা হবে তখন অবশ্যই একই পংক্তিতে পড়বে না। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের আধারে প্রগতিশীলতার বিচারের নিরিখে পশুদের নিদর্শন দেখিয়ে সমকামিতাকে সমর্থনের প্রশ্ন আসবে তখন ধর্ষণ যেমন সমাজ প্রগতির বিরুদ্ধকামী আচরণ তেমনই সমকামিতাও সমাজ-প্রগতির ক্ষেত্রে অন্ত রায় হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই না, মানব সমাজের আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব বা আত্মপ্রকাশকেও সঙ্কটমুখী করে তুলবে, সন্তান-অভিভাবকের মতো একটি নিগূঢ় সম্পর্ককে করে তুলবে বিরল যা কখনওই সমাজ-প্রগতির পক্ষে থাকতে পারে না, আর তাই একে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার

আড়ালে সমর্থনের প্রশ্ন আসে না, যেমন যৌনতায় সম্মতি প্রকাশের পরে প্রকাশ্যে করা সমাজের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ক্ষতিকারক তেমনি একইরকমভাবে সমকামিতার অনুশীলন সমাজ ও প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক। যুবসমাজকে কলুষিত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সচেতন প্রগতিশীল মানুষের কাজ।

উত্তর ৩ – সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা নয়া গণতান্ত্রিক চীনের সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চীনের জাপ আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, কোরীয়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত থেকে যুদ্ধে আসীন ছিলেন আর সেই সময়ে এই সেনাবাহিনীর সেনারা বহির্বিশ্বের সাথেই সম্পর্কিত ছিলেন। এই সময়ে এই সকল সহযোগী কোনও দেশেই এই দুই দেশের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন এমন কোনও অভিযোগ ওঠে নি। তাই উদাহরণ স্বরূপ আমরা এই দুই দেশের সেনাদের নাম উল্লেখ করেছি, কিন্তু অন্যান্য দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল এমনকি ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীতেও সমকামিতার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তাই এই সকল দেশগুলি নিদর্শন হিসাবে আনিনি।■

পাঠকের কলম ঃ

প্রিয় সম্পাদক,

সমীক্ষণের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে এক পাঠকের দ্বারা প্রেরিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ওই রচনা প্রসঙ্গে সম্পাদকমন্ডলী সকল পাঠকের কাছে বিতর্ক আহ্বান করেছেন। আমার উক্ত রচনাটি মনগড়া এক বিশ্বাস নির্ভর অবৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা বা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণসমৃদ্ধ প্রচার বলে মনে হয়েছে। উক্ত রচনাটিকে খন্ডন করতে আমি ওয়েবসাইট থেকে যুক্তি নির্ভর, বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি রচনা সংক্ষিপ্তরূপে অনুবাদ করে পাঠালাম। আশা করি পাঠকরা বিজ্ঞান মনস্ক মন নিয়ে রচনাটি বিশ্লেষন করে অবৈজ্ঞানিক এবং অসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে সরব হবেন। রচনাটির সূত্র ঃ http//www.collective-evolution.com/ 2013/02/08

সংযুক্তা চক্রবর্তী
বেহালা, কলকাতা ৩৪

৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের তথ্য প্রমাণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্যসৃষ্ট নয়

বিগত কিছু বছর ধরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে বিতর্ক অন্যতম প্রধান বড় বিতর্ক। এই বিতর্ক এখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, বিনোদন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। এই বিতর্ক এমন জায়গায় চলে গেছে যে, এমন রায় আমাদের যেন মেনে নিতেই হবে – বর্তমান বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য আমরা মানুষেরাই দায়ী। এই কারণে আমাদের সময় এসেছে সকল সম্ভাবনার প্রতি নজর করা।

নোট ঃ দয়া করে সমগ্র রচনাটি পড়ার আগে সিদ্ধান্তে পৌছাবেন না।

এই রচনাটিতে যা পেশ করা হচ্ছে তা হল আন্টার্কটিকার ভস্তক স্টেশনে সংগৃহীত একটি গবেষণামূলক তথ্য। এটা এমন কিছু নতুন তথ্য নয়, তবুও এটা এমন এক তথ্য যা প্রশ্নাতীতভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মি প্রসঙ্গে মানুষকে যেভাবে দায়ী করা হচ্ছে তা খারিজ করে দেয়। এই গবেষণাটি করেছেন রাশিয়ান এবং ফরাসী বিজ্ঞানীদের একটি গ্রুপ বহু বছর ধরে। এই গবেষণাটি কারা করেছেন সেটা এই কারণেই বলা প্রয়োজন যে, যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে যে পক্ষপাতিত্ব আমাদের মনে টিঁকে আছে তা দূর করার প্রয়োজন। তথ্যে যাওয়ার আগে আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই তথ্য কোনও কাল্পনিক বা মন গড়া মিথ্যা তথ্য নয়, এটা খুবই সত্য। সবশেষে আর একটি বিষয় নোট করতে চাই – আমি ক্ষতিকারক রাসায়নিক এবং ফসিল ফুয়েলের অতিরিক্ত ব্যবহার, পরিবেশের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ ডাম্প করা বা যত্রতত্র নিক্ষেপ করার পক্ষে নই। আমি জানি যে আমাদের পরিবেশ নিয়ে আমরা যা করছি

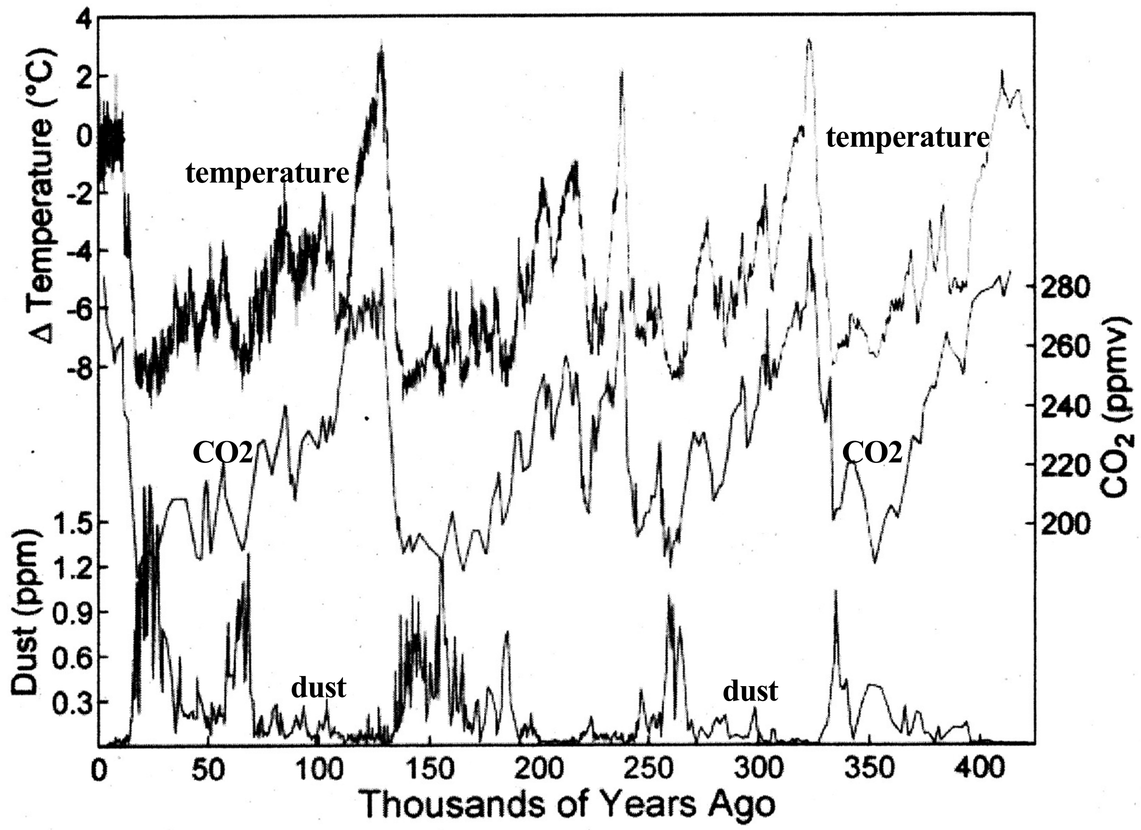

তা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কিন্তু তা চাপা পড়ে যাচ্ছে বা গুরুত্ব হারাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ নিয়ে ভুল মতের পক্ষে প্রচারের জন্য। পরিবেশ নিয়ে আমাদের ক্রিয়াকলাপ বদল করতে হবে কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণ সবচেয়ে বড় ইস্যু নয়।

ভস্তক আইস কোর
(মাটির গভীর থেকে কেটে তোলা বরফ) তথ্যাবলী

ভস্তক আইস কোর স্যাম্পেল পাওয়া গেছে আন্টার্কটিকার ভস্তক লেকের থেকে ৩৬২৩ মিটার পর্যন্ত (ভূমিতল থেকে) গভীরে ড্রিল করে কাটা বরফ খন্ডগুলি থেকে। ভস্তক আইস কোর বিশ্লেষণ করে যে গ্রাফ বা লেখচিত্র তৈরী করা হয়েছে তা বাতাসে মুক্ত কার্বন ডাই অস্কাইড গ্যাস এবং বিশ্বের গড় তাপমাত্রার সম্পর্ক দেখায় (লেখচিত্র)। এই লেখচিত্র আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস – বিগত ৮০০ বছর ধরে বাতাসে কার্বন ডাই অস্কাইড বাড়ার জন্য ক্রমশঃ বিশ্ব উষ্ণ হয়ে উঠছে, সম্পূর্ণ খন্ডন করছে। এর অর্থ হল – বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাবৃদ্ধি পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়, যদিও তা অতি সামান্য মাত্রায় প্রভাব ফেলে। ভস্তক আইস কোর বিশ্লেষণ করে পাওয়া লেখচিত্রের সাহায্যে বিগত ৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার বছর অন্তর প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা চক্রাকারে বাড়া এবং কমার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি ও শীতলায়ন-এর সাথে সাথে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাও যথাক্রমে বাড়ে এবং কমে। এর কারণ কী? প্রকৃতিক

কারণে যখনই পৃথিবী ঠান্ডা হয় তখন সমুদ্রের জলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশী দ্রবীভূত হয় এবং বাতাসে মুক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড কমে। আর পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রাকৃতিক কারণে বাড়লে সমুদ্রের জল থেকে দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে তার পরিমাণ বাড়ায়।

এই তথ্য প্রমাণ করে যে প্রাকৃতিক কারণে একটা নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চক্রাকারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া-কমার সাথে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে-কমে। ভস্তক আইস কোর তথ্যাবলী পৃথিবীর ইতিহাসে বিগত ৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরে এমনটাই যে হয়েছে তা প্রমাণ করে। এটা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে ১৫০ বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে শিল্পের সংখ্যা এবং তা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা বর্তমান সময় থেকে অনেক কম ছিল। আজ থেকে ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ বছর আগে নিশ্চই আরও কম ছিল এটা সকলেই মানবেন। অথচ ভস্তক আইস কোর তথ্যাবলী জানাচ্ছে যে আজ থেকে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা এবং বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল বিগত ৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের মধ্যে। এর কারণ কী? এর কারণ সেই সময়টা ছিল পৃথিবীর স্বাভাবিক উষ্ণতা পরিবর্তন চক্রের উষ্ণ অন্তঃগ্লেসিয়াল পর্যায়ের চূড়া। সেই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা এবং বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দুই-ই বর্তমান সময়ের চেয়ে বেশী ছিল। বর্তমানে আবার পৃথিবী উষ্ণ অন্তঃগ্লেসিয়াল পর্যায়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। প্রাকৃতিক চক্রের নিয়ম অনুসারে কিছু সময় পর থেকে পৃথিবী আবার শীতল বরফ যুগে প্রবেশ করবে যখন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কমতে থাকবে এবং মেরু অঞ্চলে প্রচন্ড হারে তুষারপাত শুরু হবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে বায়ুমন্ডলে স্বাভাবিকভাবে ৮০০ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস রয়েছে এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য বছরে ২৭ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অস্কাইড প্রতি বছর বাড়ছে, যা মোট কার্বন ডাই অক্সাইডের ৩%, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা বড় অংশ সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং সমুদ্রে ধীরে ধীরে তা চুনা পাথর, চক এবং প্রবাল ইত্যাদি অমেরুদন্ডী প্রাণীর বাইরের খোলস তৈরী করতে কাজে লাগে। অর্থাৎ মানুষের কারণে প্রতিবছর যে ৩% অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুমন্ডলে আসে তার বড় অংশই সমুদ্রে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং মাত্র ০.২৭% গ্রীণহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করে। এই মুহূর্তে যদি আমরা সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্প বন্ধ করে দিই তবে তা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রভাবই ফেলবে না। অথচ মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রবক্তারা বলছেন বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাবৃদ্ধির জন্য পৃথিবী এমন এক উষ্ণ অবস্থায় পৌঁছাতে চলেছে তা থেকে ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নাই।

যাই হোক, তথ্য নিজেই সত্যতাকে তুলে ধরে এবং যে কোন অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয়।

উষ্ণায়ন নিয়ে বর্তমানের প্রচলিত বিশ্বাসের সমস্যা

এই মুহূর্তে আমরা বিস্মিত যে, যে সংস্থাগুলি বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কাছে ভস্তক আইস কোর-এর তথ্যাবলী কিভাবে চোখ এড়িয়ে গেল? আল গোরে কিভাবে তার চলচিত্রের জন নোবেল পুরস্কার পেলেন? আইপিসিসি ধারাবাহিকভাবে কেন বিশ্ব উষ্ণায়নের তৈরী করা মডেল খাওয়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে যখন এই তথ্যাবলী সবকিছু ব্যাখ্যা করে দেয়? বাস্তব সত্য হল বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে তারা যা পেশ করছে তার উৎস অন্য কিছুর চাইতে বেশি রাজনৈতিক। জলবায়ু ব্যবস্থা প্রাকৃতিক কারণে পরিবর্তিত হতে পারে না এটা ধরে নিয়ে তারা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য মানুষের ক্রিয়াকলাপকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শিয়ে তাদের বিশ্বাস প্রচার করছেন। ভস্তক আইস কোর থেকে পাওয়া তথ্যাবলী প্রমাণ করে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই সিদ্ধান্ত আল গোরে এবং আই পি সি সি'র দাবিকে খারিজ করে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং মনুষ্যজনিত এই বিশ্বাস বিশ্বজুড়ে প্রচার করতে পারলে পশ্চিমী দুনিয়ার রাজনৈতিক এবং আর্থিকভাবে প্রচুর লাভ হবে। এর ফলে তারা অল্প খরচে প্রচুর পণ্য উৎপাদন করে যেসব দেশ যেমন চীন, ভারত, তাদের উপর বিপুল করের বোঝা চাপাতে পারবে। তাদের পণ্য উৎপাদনের খরচ বাড়ানো ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। এতে পশ্চিমী দুনিয়ায় মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের জন্য উৎপাদন খরচের যে বৃদ্ধি হয়েছে তার সাথে স্বল্প খরচে উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচ একই স্তরে পৌঁছাবে।

আমাদের কিছু মানুষের অনিয়ন্ত্রিত অহঙ্কারের মত সহজ

➔

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা?

সাধারণ মানুষকে যারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে অবজ্ঞা করেন সমাজের সেই গণ্যমান্যরাই কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখেন

কথায় কথায় সমাজের তথাকথিত সুশিক্ষিত লোকেরা, মন্ত্রী-আমলা-বিচারক-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী-খেলোয়াড়-অভিনেতারা বলে থাকেন গরীব অশিক্ষিত মানুষদের জন্য আমাদের সমাজে এত কুসংস্কার, টিঁকে আছে এত অন্ধকার। হ্যাঁ দেশের দরিদ্র, তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষেরা আজও ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের অধিকাংশের ঘরে আধুনিক শিক্ষার আলো পৌছায়নি। স্বাস্থ্যের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজায় দরজায় ঘুরে তারা সমাজের অধিপতি তথা ধর্মগুরুদের শেখানো ভাগ্যের স্মরণাপন্ন হন। দরিদ্র পরিবারে জন্মেছেন বলে তাদের জন্য লিখিত ভাগ্যলিপি মেনে নিতে হবে বলেই তারা মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে ভাগ্য পরিবর্তন নিয়ে যারা ব্যবসা করেন সেই 'শিক্ষিত'রা তাদের আরও ঠকিয়ে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখেন।

অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ঐ শ্রমজীবী গরীব মানুষের শ্রমের ফল যারা ভোগ করেন তারা কি করেন? শল্যচিকিৎসকরা কপালে কাঁচি ছুঁইয়ে তারপর রোগীর শরীরে হাত দেন আর রোগীর পরিবারকে বলেন 'ভগবানকে ডাকো'। বিজ্ঞানীরা হাতে মাদুলি-তাবিজ-কবজ পড়ে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন। পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান সব মিলিয়ে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের বিজ্ঞানের বদলে কুসংস্কার মেনে চলতে শেখান। বিজ্ঞানীরা পূজো দিয়ে তবে এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেন। নেতা-মন্ত্রীরা ভোটের আগে মন্দির-মসজিদ-গির্জায় প্রার্থনা করেন আর খবরে তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। সরকারি বাস-ট্রেন-ব্রীজ-ভবন-রাস্তা উদ্বোধন পূজার্চনা ছাড়া শুরু হয় না। এরাই আবার মানুষের মধ্যে ভূত-প্রেতের ভয় ছড়ায়। এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় ত্রিপুরা বিধানসভা ভবনে নারায়ণ পূজার বিষয়ে রিপোর্টটি পড়ে দেখবেন।

➔

●*৪ লক্ষ ২০ হাজার বছরের তথ্য প্রমাণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্যসৃষ্ট নয়*

বিষয়টাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়নের এই বিশ্বাস এবং অনুমানকে সত্য দাবি করে বহু বিজ্ঞানী বর্তমানে প্রচুর অর্থ এবং যশের অধিকারী। এদের মধ্যে কিছু বিজ্ঞানী এই বিশ্বাস প্রচার করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরী করেছেন। ফলে তাদের বিশ্বাসের প্রতি কোনও আঘাত শুধুমাত্র কোনও নতুন বিজ্ঞানকে মেনে নেওয়া নয়, বিজ্ঞানকে মেনে নিলে তাদের দ্বারা এতদিন ধরে প্রচারিত বিশ্বাস তা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। অধিকাংশের পক্ষেই এই সত্যের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব উষ্ণায়নই বোধহয় এক এবং একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যাকে আধুনিক বিজ্ঞান ভুল বলে প্রমাণ করছে, অথচ গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে প্রচারিত তত্ত্ব টিঁকে আছে খোলা মনের এবং নিরহঙ্কারী বিজ্ঞানীদের অপ্রতুলতার জন্য। এই ক্ষেত্রে বহু বিজ্ঞানী আছেন যারা প্রথিতযশা কোম্পানীগুলিতে তাঁদের অবস্থান হারিয়েছেন, যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্বন্ধে তাঁদের বিচার পেশ না করে চুপ করে আছেন। এই ঘটনা বহু বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেই সত্য যারা প্রকৃত সত্য খুব ভালভাবেই জানেন। ■

তথ্যসূত্র ঃ

- http : //www.oism.org/pproject/s33p36.htm
- http : //english.pravda.ru/science/earth/11-012009/106922-earth_ice_age-1
- http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/labs/Lab10_Vostok/Vostok.htm
- Arthur B.Robinson, Noah E. Robinson & Willie Soon, Oregon Institute of Science & Medicine

[পাঠকদের কাছে আবদেন বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গে পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় এবং সংযুক্ত চক্রবর্তী'র মতো আপনারাও এ প্রসঙ্গে বিগত সংখ্যা থেকে চলা বিতর্কে অংশ নিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন। সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, দেশের সর্বত্র নেতা-মন্ত্রী-শিল্পপতিরা এই কাজ করে চলেছেন। কর্নাটক রাজ্যের বিধানসভা ভবনের নাম বিধানা সৌধ। গত ২০১২ সালে অগাস্ট মাসে একজন সরকারি আধিকারিক বলেন যে ওই ভবনের একটি দেওয়াল বাস্তুশাস্ত্র মেনে হয়নি তাই ওটি ভেঙে ফেলতে হবে। সরকার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেয় যে অলুক্ষুণে ওই দেওয়াল অনতিবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। ভেঙে নতুন করে গড়া হল ওই দেওয়াল। কার পয়সায় না জনতার পয়সায়। ২০১৩ সালের জুন মাসে পুনরায় একই কারণে ওই ভবনের অন্য একটি দেওয়ালও ভাঙা হল।

২০০৮ সালে মধ্য প্রদেশ বিধানসভার একজন বিধায়ক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন বিধানসভায় কথা ওঠে যে এই বিধানসভা ভবনটি নাকি বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে তৈরী করা হয়নি, তাই নাকি বিধানসভার ১৮ জন সদস্য মারা গেছেন। ওই ভবনটি ১৯৯৬ সালে চার্লস কোরিয়া নামক একজন স্থাপত্য বিজ্ঞানী তৈরী করেছিলেন তাকে এর জন্য দায়ী করে বাস্তুশাস্ত্র মেনে সংস্কারের প্রস্তাব ওঠে বিধানসভায়।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও একজন অতি ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন আধ্যাত্মিক গুরু এবং জ্যোতিষ চন্দ্রস্বামীর কথায় চলতেন। তার বেছে দেওয়া দিনক্ষণ মেনেই ঐ প্রধানমন্ত্রী কাজ চালাতেন। এই ধর্মগুরু যে একজন জালিয়াত তা জানতে কারুর বাকি নেই। ফরেন এক্সেচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (ফেরা) আইন না মেনে প্রচুর দুর্নীতি করায় সুপ্রিম কোর্ট তাকে ১৪ লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা করে। প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতায় তিনি নানা আইন ভঙ্গ করেছেন।

ভারতীয় মুদ্রার নতুন সিম্বল নির্দিষ্ট হওয়ার কিছুদিন পর ২০১২ সালের মে মাসে এক 'প্রখ্যাত বাস্তুশাস্ত্র বিশারদ' রাজকুমার ঝঞ্ঝারি মন্তব্য করেন যে বাস্তুশাস্ত্র মেনে এই সিম্বল তৈরী না হওয়ায় নাকি ভারতীয় মুদ্রার দর আন্তর্জাতিক বাজারে কমে যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন ওঠে বিশ্বের প্রায় সব দেশের মুদ্রামান কমছে কেন? এর জন্য কি বাস্তু শাস্ত্র দায়ী নাকি অর্থনীতি?

২০১২ সালে "Superstition@Workplace" নামক একটি সার্ভে করা হয় দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কুসংস্কার কী পরিমাণে টিঁকে আছে তা জানার জন্য। এই সার্ভে করেছে একটি কোম্পানি যা নাম টিম লীজ। এই সংস্থা দেশের প্রধান ৮টি শহরের ৮০০টি বড় কোম্পানিতে কর্মী-ম্যানেজার-অফিসারদের মধ্যে সার্ভে করেছে। তাদের সার্ভে রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে কর্মীদের ৬১% কুসংস্কারে বিশ্বাস করাকে মেনে নেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কর্মীদের ৫১% নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কুসংস্কার অনুশীলন করার কথাও মেনে নিয়েছেন। কর্মীদের মধ্যে ৪৮% মনে করেন যে কুসংস্কারগুলি মেনে চললে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা নাকি বাড়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে **ঐ সমস্ত কোম্পানিগুলির ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের কুসংস্কার মেনে চলাকে বাধাদান করেন না বরং উৎসাহ দেন যদি না তা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বাধাদান করে।** তথ্য নিজেই সত্য প্রকাশ করে। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।■

ত্রিপুরার নয়া বিধানসভা ভবনে ভূত তাড়াতে নারায়ন পূজা!

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় নতুন বিধানসভা ভবন তৈরী হয়েছে অতি সম্প্রতি। দুবছর আগে এই ভবনে কাজকর্ম চালু হয়েছে। তারপর থেকেই নাকি শুরু হয়েছে অশরীরী আত্মাদের দৌরাত্য! কর্মীদের অনেকে সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন সারাদিন লোকসমাগম থাকলে নাকি ভূতেরা চুপচাপ থাকে। সন্ধ্যের পর ফাঁকা হলে বা ছুটির দিনে শুরু হয় ওঁনাদের দৌরাত্য! এর কারণ কী? কর্মীদের কয়েকজন জানিয়েছেন যে নির্মাণের সময় নাকি বেশ কিছু নরকঙ্কাল বেরিয়ে এসেছিল। নয়া বিধানসভার লাগোয়া জিবি হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশগুলি নাকি এই অঞ্চলের টিলা জমিতে পুঁতে দেওয়া হত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় নিহত সৈনিকদের গণকবরও ছিল এখানেই। এরই উপর তৈরী হয়েছে নতুন এই ভবন। ফলে মাটির নীচের অতৃপ্ত আত্মারা বদলা নিচ্ছে ভবন কর্মীদের উপর !

এইসব অশরীরী বাসিন্দাদের তাড়াতে তাই রীতিমত চাঁদা তুলে সেখানে শালগ্রাম শিলা এনে নারায়ণ পূজা করেছেন বেশ কিছু কর্মী। এরা বাম-অবাম দুলেরই সমর্থক। ভূতেদের তুষ্ট করতে ছিল চাল-কলা-ফল-বাতাসা। পূজার পর শান্তির জল ছিটানো হল গোটা দপ্তরের প্রতিটি তলায়, প্রতিটি ঘরে। বাম কর্মচারী নেতাদের হুলিয়া ছিল কোনও কর্মী এমনকি মোবাইলেও ছবি তুলতে পারবেন না। সংবাদ মাধ্যমের নজর এড়িয়ে রবিবার ছুটির দিনে লুকিয়ে পূজা হলেও খবর প্রকাশ্যে

আসতেই রাজ্যে হইচই। এমএলএ, অফিসার, মন্ত্রীরা কি কিছুই জানতেন না? নাকি ভূত তাড়াতে কর্মচারিদের উদ্যোগে তাদেরও মদত ছিল! দেশে এই একটি রাজ্যেই এখনও 'মার্কসবাদীদের' শাসন টিমটিম করে চলছে। দীর্ঘদিনের এই বাম শাসনে রাজ্যবাসী তো দূর অস্ত রাজ্য বিধানসভার কর্মী-অফিসার-এমএলএ-মন্ত্রীরা কতটা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছেন তা এই তথ্য বিচার করলেই বোঝা যায়।

শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সরকারি দপ্তরে ভূতের গল্প নতুন কিছু নয়। খোদ কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং ভূতের গল্পের ভান্ডারে সমৃদ্ধ। সুব্রত মুখোপাধ্যায় তখন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভায় তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্বে। জরুরী অবস্থা চলছে, খবরের কাগজে কি ছাপা হবে তার ছাড়পত্র মিলত খোদ মন্ত্রী এবং অফিসারদের কাছ থেকে। সুব্রতবাবু নাকি একদিন ভিআইপি লিফটে তিনতলায় উঠছেন। তিনতলায় লিফট থেকে বেরিয়ে তিনি এক পুলিশের মুখোমুখি। প্রতি-অভিবাদন করতে গিয়ে সুব্রতবাবু দেখলেন কনস্টেবল মাটি থেকে ফুট খানেক উপরে শূন্যে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকছেন! ঘামতে ঘামতে মন্ত্রীর তখন কাপড়ে চোপড়ে! কোনও মতে নিজের ঘরে ঢুকে সেন্ট্রাল গেটের অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। জানতে পারলেন সেদিন তিনতলায় কাউকে পোস্টিংই নাকি দেওয়া হয়নি! ব্যাস, দুঁদে মন্ত্রী সুব্রতবাবুর তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! এরপর কখনও তিনি আর রাতে মহাকরণে জাননি।

এমন কাহিনী নতুন নয়। আমাদের রাজ্যে সাবধানী মুখ্যমন্ত্রী এই কারণেই নতুন দফতর চালুর আগেই ঘটা করে পূজা করে তবে দফতরে পা দিয়েছেন!

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিন্ন করে সমাজকে যতই এগিয়ে দিতে চাইছে, সমাজের অধিপতিরা ততই নতুন নতুন ভূত-প্রেতের জন্ম দিয়ে তাকে পিছনে টানার মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। অশরীরীদের জন্মদাতাদের সমাজ থেকে না তাড়ালে এইসব অশরীরীদের হাতে থেকে সমাজ মুক্ত হবে না।■[*তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার, ইন্টারনেট সংস্করণ*]

দেবদাসী বা যোগিনী প্রথা বহাল তবিয়তে টিঁকে আছে আইন করেও তাকে রোখা যায় নি

মহিলাদের সামাজিক অধিকারের জন্য সংসদে কতই না লড়াই চলছে। সংসদ বিধানসভা-পৌরসভা-পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, পুলিশ-প্রশাসন এমনকি সেনাবাহিনীতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আইন-তরজা কম হচ্ছে না। কিন্তু নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। দিল্লীতে নির্ভয়ার ধর্ষণের পর দেশব্যাপী আন্দোলন, আইন প্রণয়ন ধর্ষণের হার কমাবার বদলে বাড়িয়ে চলেছে। সমাজের ধার্মিক নেতারা এই অধর্মাচার বন্ধ করতে ধার্মিক হয়ে ওঠার কথা বলছেন। কিন্তু ধর্মস্থানে-দেবতার আলয়ে কি ঘটে কেউ বলছেন না।

সম্প্রতি এক সরকারী তথ্যে জানা যাচ্ছে সদ্য জন্ম নেওয়া দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে প্রায় ৩০ হাজার দেবদাসী বা যোগিনী রয়েছেন। সদ্য বিভক্ত পার্শ্ববর্তী অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন মন্দিরে দেবদাসীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ফেব্রুয়ারী এবং মে মাসে দক্ষিণ ভারতের এই অঞ্চলে 'ভগবানের ইল্লামা'র উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় স্থানীয় মহিলা পাচারকারী দালালদের সাহায্যে পুরোহিতরা হতদরিদ্র পরিবারগুলি থেকে ফুসলিয়ে বা জোর করে তুলে আনা কুমারী মেয়েদের ভগবানের দাসী হিসাবে উৎসর্গ করে। সরকারী তথ্য অনুসারে এই মেয়েদের ৯০ শতাংশেরও বেশী হল দলিত সম্প্রদায় থেকে আগত এবং হতদরিদ্র। এই দেবদাসীদের কাজ মন্দিরের সব কাজের পাশাপাশি পুরোহিত এবং স্থানীয় বাবুদের শয্যাসঙ্গী হওয়া। প্রায় সমস্ত মন্দিরই কার্যতঃ যৌন ব্যাভিচারের কেন্দ্র। ভগবানের নামে এদের উপর চলে যৌন পীড়ন। **শুধুমাত্র যৌনলিপ্সা মেটানো নয়, এই যোগিনীদের দিয়ে যৌন ব্যবসা করিয়ে পুরোহিতকূল এবং মন্দির কমিটিগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।**

শুধু অন্ধ্রপ্রদেশই নয় দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলি, মহারাষ্ট্র, গুজরাত সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নানা ধর্মস্থানে গরীব-অনাথ-অসহায় মেয়েদের উপর অত্যাচার চলছে। ধর্মগুরুরা এই যোগিনীদের কাজকে অতি পবিত্র ও পুণ্য কাজ বলে প্রচার করেন এবং সিদ্ধিলাভের উপায় বলে থাকেন। সমাজপতি ধনী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা এই যোগিনীদের মাহাত্ম প্রচার করে এবং তাদের সান্নিধ্যলাভ করলে সমস্যাজর্জরিত পুরুষ এবং তার পরিবারের মুক্তি লাভের কথাও বলে। প্রচার করা হয় এই যোগিনীদের শয্যাসঙ্গী হলে অতি প্রাকৃত শক্তির সংস্পর্শে আসা যায় এবং স্বয়ং ভগবানের

আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এই প্রচার এতই শক্তিশালী যে পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য বহু গৃহবধূ তাদের স্বামীদের যোগিনীদের শয্যসঙ্গী হতে পাঠিয়ে দেয়।

১৯৮৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার আইন করে এই মন্দিরের বেশ্যাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যা যোগিনী অ্যাবোলিশন অ্যাক্ট নামে পরিচিত এবং কোনও ব্যক্তি কোন মেয়েকে যোগিনী করার কাজে লিপ্ত হলে ৩ বছরের সাজা এবং ৩ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার কথা আইনে বলা হয়। কিন্তু এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যোগিনীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

এই যোগিনী বা দেবদাসীদের যৌবন ফুরিয়ে গেলে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের কন্যা সন্তানদের জোর করে মায়ের আসনে বসানো হয় এবং শেষ জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

এইসব যোগিনী বা দেবদাসীদের মুক্তিদাতা সেজে সরকারী মদতে তৈরী হয়েছে কিছু এন জি ও। এদের একটির নাম 'আশ্রয়'। এরা বর্তমানে যেসব মন্দিরে এই যোগিনীরা নির্যাতিত হচ্ছেন তাদের মুক্তির জন্য কোন কাজ করে না। এই প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে কোন সামাজিক আন্দোলন করে না। বরং যোগিনী ও তাদের অবৈধ সন্ত ানদের সুরক্ষা ও অধিকারের নাম করে এই দেবদাসী ব্যবস্থাকে আইন বা সমাজ স্বীকৃত করার কাজ করে। সাধারণভাবে যৌবন ফুরালে মন্দিরগুলো থেকে এই যোগিনীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা সমাজে ভবঘুরের মত জীবন যাপন করে। এই এন জি ও-রা এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে শাসকশ্রেণীকে মুক্তি দেওয়ার কাজ করে। তারা বিতাড়িত যোগিনীদের বিড়ি বাধা বা অন্য কাজে লাগিয়ে আশ্রয় দেয়। যোগিনীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শেখায়। তাদের কর্মীরাই সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে যে এই প্রথা বিলোপ হওয়া দুঃসাধ্য। অধিকাংশ পুলিশ এই আইনের কথা জানেই না এবং জেনেও সহযোগিতা করে না। এই ট্র্যাডিশন বহুকালের এবং কুসংস্কার এত গভীরে প্রোথিত যে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন যে যোগিনীদের বিশেষ ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। এছাড়া হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ প্রথা এত শক্তিশালী যে একে উচ্ছেদ আইন দিয়ে করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত তথ্যই অবস্থাকে বুঝতে যথেষ্ট। সমাজের গভীরে প্রোথিত এই কুসংস্কার এবং তাকে ভিত্তি করে শোষণ-নিপীড়নকে উচ্ছেদ করতে হলে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে প্রচলিত সমাজের অবসানের লক্ষ্যেই এগুতে হবে।

[তথ্যসূত্র ঃ http://www.ipsnews.net]

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

কফির বর্জ্য থেকে গাড়ির তেল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ বাথ-এর বিজ্ঞানীরা কফির বর্জ্য থেকে বায়োফুয়েল সৃষ্টির প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে কফি শস্য দানার – যেমন রোবাসটা, অ্যারাবিকা ইত্যাদির খোসার ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম বায়োফুয়েলের উপযোগী এবং তা থেকে সস্তায় বায়োফুয়েল বা জৈব জ্বালানি প্রস্তুত করা সম্ভব।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস চাক বলেন যে প্রতি বছর পৃথিবীতে ৮০ লক্ষ টন কফি শস্য উৎপন্ন হয়। ইনস্ট্যান্ট কফি প্রস্তুতির সময় এর থেকে যে বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসে তা থেকে তা শতকরা ২০% তেল প্রস্তুত করা সম্ভব। বায়োফুয়েল বা জৈব জ্বালানি প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য খাদ্য বস্তু থেকে যে তেল পাওয়া যায় তার সাথে কফির বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত তেল একই ধর্মের। সুতরাং কফির বর্জ্য থেকে আগামী দিনে প্রচুর জৈব জ্বালানি মিলবে যা পৃথিবীর জ্বালানি সমস্যার দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে। ■ [টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৮.৬.১৪]

টমেটোর রস থেকে প্রস্তুত বটিকার সাহায্যে হার্টের চিকিৎসা

লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন যে কাঁচা টমেটো হার্টের চিকিৎসার পক্ষে ভাল। এই টমেটো রসে লাইকোপিন নামক একপ্রকার স্বাভাবিক অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট আছে। এই টমেটো রস থেকে প্রস্তুত বটিকা ৭২ জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের উপর প্রয়োগ করে তারা রুগীদের ব্লাড ভেসেলস এর কাজকে উন্নত করার প্রমাণ পেয়েছেন। এই লাইকোপিন অলিভ অয়েল-এর (জলপাই থেকে প্রস্তুত তেল) সাথে মিশ্রিত বটিকা তারা ৭২ জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন।■ [টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১.৬.১৪]

-ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ-

এপ্রিল ২০১৪

৩ ঃ নাসার মহাকাশযান 'ক্যাসিনি' এবং 'ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক' শনির উপগ্রহ 'এনসেলাডাস'(enceladus)-এর অভ্যন্তরে এক সমুদ্রের উপস্থিতি আবিষ্কার করেছে, এই সমুদ্রে বহির্বিশ্বের (extra-terrestrial) অনুজীবের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। –নাসা

৪ ঃ ভার্জিনিয়া স্কুল অফ মেডিসিন-এর বিজ্ঞানীরা স্টেম কোষ থেকে একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ তৈরী করতে সফল হয়েছেন। এই সফল পরীক্ষা স্টেম কোষকে কাজে লাগিয়ে মানুষের শরীরের বিকল হয়ে যাওয়া অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। –ফিজ ও আর জি

১০ ঃ নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০,০০০ আলোক বর্ষ পর্যন্ত দূরত্ব মাপতে সফল হয়েছে। ২৪ বছরের পুরানো এই টেলিস্কোপ স্থানিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে এই দূরত্ব মাপা সম্ভব হয়েছে। নোবেল প্রাপক অ্যাডাম রিজ-এর মতে এর ফলে মহাকাশের অনেক অজানা বস্তু সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানা যাবে। –নাসা

১৪ ঃ নাসা'র ক্যাসিনি মহাকাশ যান শনির বলয়ের উপর ছোটো বরফের মতো একটি বস্তুর পর্যবেক্ষণ করেছে যা শনির একটি নতুন উপগ্রহ হতে পারে। –নাসা

১৬ ঃ ফার্টিলাইজেশান বা নিষেক ঘটার জন্য শুক্রানুর ইজুমো ১ নামে প্রেরক প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গেছিলো কিন্তু এই বছর ডিম্বানুর গ্রাহক প্রোটিন জুনো'র আবিষ্কার করে কেমব্রিজের সেল সারফেস সিগন্যালিং ল্যাবটেরি, মাউস প্রোডাকসন টিম এবং ইলেকট্রন অ্যান্ড অ্যাডভান্সড লাইট মাইক্রোস্কোপি'র বিজ্ঞানীরা ইনফার্টিলিটি'র চিকিৎসার এক নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম হতে পারবেন। –নেচার পত্রিকা

২৫ ঃ সংযুক্ত রাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশান এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি Tstse মাছির জেনেটিক কোড জানতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে আফ্রিকার সাহারার নিকটবর্তী অঞ্চলে 'স্লিপিং সিক্‌নেস বা ঘুমের অসুস্থতার চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। –দ্য গার্ডিয়ান

২৮ ঃ 'স্ট্যানফোর্ড'-এর বায়ো ইঞ্জিনিয়াররা অনেক দ্রুততর, আরও বেশি শক্তি-সাশ্রয়কারী মাইক্রোচিপ আবিষ্কার করেছেন যা একটি কম্পিউটার থেকে প্রায় ৯০০০ গুণ দ্রুততর এবং অনেক বেশি শক্তি সাশ্রয়কারী। –স্ট্যানফোর্ড নিউসার্ভিস

৩০ ঃ ইউরোপীয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরি'র বিজ্ঞানীরা ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ-এর দ্বারা সৌর মন্ডলের বাইরের একটি গ্রহ 'বিটা পিক্টোরিম বি'র একটা গোটা দিন পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে এই গ্রহটির গোটা দিন সম্পন্ন হতে সময় লাগে মাত্র ৮ ঘন্টা। যা সৌর মন্ডলের যে কোনও গ্রহের থেকে অনেক কম। এই গ্রহটির বিষুবরেখা প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে ঘোরে। এই তথ্য বহির্বিশ্বের গ্রহগুলিতে ভর ও চক্রগতির সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক নতুন আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছে। –ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরি

মে ২০১৪

৭ ঃ ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপ্‌স রিসার্চ ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা ডিএনএ'র গঠনের পরিবর্তন করার মাধ্যমে নতুন ধরনের জীবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। –বিজনেস ডে

ঃ ডেনমার্কের আহার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিশ ও চাইনিজ গবেষকরা ট্যারান্টুলা মাকড়সার জিনোম-এর গঠন -এর ক্রমানুসার সফলভাবে নিরূপণ করেছেন। এই আবিষ্কার মাকড়সা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিত তথ্য দিতে সাহায্য করবে। গবেষকরা মাকড়সার জিনোমের সাথে মানুষের জিনোমের ক্রম (Sequence)-এর কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। –আহার্স বিশ্ববিদ্যালয়

১৩ ঃ ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউট অফ পলিমার রিসার্চ, মেইন্‌জ এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর-এর বিজ্ঞানীরা গ্রাফেনের তাপ পরিবহনের অত্যধিক ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন। –ফিজ্‌ ও আর জি

১৪ ঃ আমেরিকার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এক দক্ষিণ কোরিয়ার ডেইয়ু গিয়োবাক ইন্সটিটিউট-এর গবেষকরা একটি চিপের মতো খন্ড আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা হাজার হাজার সজীব কোষকে বাছাই করা ও সঞ্চয় করে রাখা যায় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে (প্রায় ১ মিনিটের মধ্যে)। –ডিউক ইউনিভার্সিটি

১৭ ঃ মিউজিয়াম অফ প্যালেন্টোলজি এগিডিও

ফারুগ্রিও, আর্জেন্টিনার ডঃ জোস লুই কার্বালিগে ও ডঃ দিয়েগো পলের নেতৃত্বে একটি দল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ডাইনোসরের কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। এই ডাইনোসরের কঙ্কাল থেকে জানা গেছে যে এটির ওজন ছিল প্রায় ৭৭ টন। এটির প্রজাতি ছিল টিটানোসর। –বিবিসি নিউজ

২৫ ঃ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ও সান ডিয়েগো স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষকরা অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের জন্য দায়ী মিউটেড জিনটিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। –ইউ সি সান ডিয়েগো

২৮ ঃ জার্মানি, আমেরিকা ও ভারতের গবেষকরা প্রোটিনের সংকেতের একটি তথ্যভান্ডার যার নাম দিয়েছেন 'প্রোটোমি' প্রকাশ করেছেন, যা বিশ্ববাসীর কাছে উপলব্ধ হয়েছে। এর ফলে জেনেটিক্স নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। –বিবিসি নিউজ

২৯ ঃ নেদারল্যান্ডের ডেলফ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাভ্‌লি ইন্সটিটিউট অফ ন্যানোসায়েন্সের কয়েকজন বিজ্ঞানী দুটি কোয়ান্টাম বিট-এর মধ্যে টেলিপোর্ট-এর মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান করেছেন, যে দুটি কোয়ান্টাম বিটের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ ফুট। –নিউ ইয়র্ক টাইমস

জুন ২০১৪

২ ঃ কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'র এম এম সি ল্যাবের বিজ্ঞানীরা দ্বিপদগামী এমন রোবটের উদ্ভাবন করেছেনযা প্রায় ২৮.৫৮ মাইল প্রতি ঘন্টায় দৌড়াতে পারে যা যেকোনো মানুষের থেকে দ্রুততর। –কুর্জওয়েল অ্যক্সিলারেটিং ইন্টেলিজেন্স

৪ ঃ ১৯৭৫ সালে পদার্থবিদ কিপ থর্ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যানা জিটকোও লাল মহাদৈত্য নক্ষত্র ও নিউট্রন নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত যে শ্রেণীর নক্ষত্রদের কথা বলেছিলেন তা ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো কেল্ডার-এর বিজ্ঞানীরা কয়েক দশক পরে আবিষ্কার করলেন। –ফিজ ও আর জি

৬ ঃ এডিনবার্গ রোসেলিন ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা চল্লিশ লক্ষ বছর আগে ছাগলের একটি প্রজাতির বিবর্তনের ফলে ভেড়া-র উদ্ভব হয়েছিলো বলে দাবি করেন। –রোসেলিন ইন্সটিটিউট

৭ ঃ ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং-এর কেভিন ওয়ারউইক অ্যালান টুরিং-এর ৬০ বছর মৃত্যু বার্ষিকি-র দিনে রয়্যাল সোসাইটি ইউজিন গুস্টম্যান নামক এমন একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামার পেশ করেছেন যেটা ৩৩ শতাংশ বিচারককে বুঝতেই দেয়নি যে সেটি মানুষ না একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম। এর ফলে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর গবেষণা এমন একটি রূপ পেলো যা ভবিষ্যতে রোবটদের মানুষদের ন্যায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়াতে সাহায্য করবে। আবিষ্কারের দিক থেকে এটি একটি অনন্য আবিষ্কার। উইকিপিডিয়া

৯ ঃ যে ডিএনএ'র প্রতিলিপি করার মাধ্যমে স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়াকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করে তোলে তাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন ডিউক ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। –সায়েন্স ডেইলি

১০ ঃ ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডস্মিথ জিওকেমিস্ট্রি কনফারেন্সে ফ্রান্সের ন্যান্সির লোরেইন ইউনিভার্সিটির জিওকেমিস্টরা দেখিয়েছেন যে পৃথিবী ও চাঁদ যা ভাবা হয়েছিলো তা থেকে ৬ কোটি বছর বেশি বয়স্ক। –ইউরেকা এলার্ট

১১ ঃ ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি'র বিজ্ঞানীরা এমন একটি চিপ আবিষ্কার করেছেন যেটি যে কোনও তরলের রাসায়নিক গঠন বলে দিতে পারে। –ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি

১৩ ঃ একটি নতুন ধরনের শংকর, নমনীয় ও শক্তি-দক্ষ সার্কিট আবিষ্কৃত হয়েছে যাকে কার্বন ন্যানোটিউবের সাথে সংযুক্ত করলে চিরাচরিত ঐতিহ্যগত উপাদান হিসাবে ইলেকট্রনিক চিপ D ব্যবহৃত সিলিকন চিপকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে। –নেচার কমিউনিকেশান

১৯ ঃ ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট এঞ্জিলা-র নরউইচ মেডিক্যাল স্কুল-এর গবেষকরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়াগুলি কিভাবে তাদের দেহের বাইরে একটি আস্ত রণ তৈরী করে অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠে তার কার্যপ্রণালী আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। –বিবিসি নিউজ

২৩ ঃ নাসা এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগের ফলে জানা গেছে যে শনির উপগ্রহ টাইটান-এর পরিবেশে নাইট্রোজেন উপস্থিত আছে। আমাদের পৃথিবীর পরিবেশেরও অন্যতম মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন। এর ফলে টাইটানকে পৃথিবীর আদি পর্যায়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। –নাসা

সংগঠন সংবাদ

শিলিগুড়িতে বিজ্ঞান মনস্ক'র আলোচনা সভা

গত ৩০শে মার্চ ২০১৪, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের একটি লনে বিজ্ঞান মনস্ক'র স্থানীয় ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি সেমিনার ও পাঠকদের মতামত নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে শহরের বইমেলায় পাঠকদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তাব এসেছিল। বিভিন্ন পাঠকের সাথে যোগাযোগ করে এই অনুষ্ঠান করা হয়। সভার উপস্থিতির মান আশানুরূপ না হলেও অনুষ্ঠান হয়েছে সুশৃঙ্খলভাবে।

স্থানীয় এক কর্মীর দ্বারা গাওয়া উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সঞ্চালক একে একে সমীক্ষণ সম্পর্কে মতামত দানের জন্য পাঠকদের ডেকে নেন। মোট ৬ জন পাঠক সমীক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত, জিজ্ঞাসা এবং প্রস্তাব পেশ করেন। এই মতামতের উপর সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে জবাবও পেশ করা হয়।

প্রথম বক্তা শিলিগুড়ির প্রদীপণ গাঙ্গুলি বলে "আমরা যখন বিজ্ঞান নিয়ে ভাবছি তখন সেই ভাবনা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া দরকা। বিজ্ঞানকে মানুষের জন্য গুরুত্ব দিতে হবে। এখানে শুকনার কাছে একটা গাছ নাকি ঝড়ে পড়ে গিয়ে আবার পরে অলৌকিকভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি এই খবর বিজ্ঞান মনস্ক-কে দিয়েছিলাম। আমাদের অলৌকিকতার বিরুদ্ধে বেশি বেশি প্রোগ্রাম করতে হবে। সাধারণ মানুষের মাঝে গিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। শুধু সেমিনার নয়, মানুষের থেকে নেওয়া জ্ঞান মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

দ্বিতীয় বক্তা শিলিগুড়ির সজল কুমার গুহ বলেন "ধন্যবাদ জানাই কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র নই। আমাদের শিখতে হবে সারা জীবন। সমীক্ষণের সংখ্যাগুলি আমাদের কাছে ভীষণ উপকারী। এই পত্রিকা পড়ে বিজ্ঞানের সমসাময়িক বিষয়গুলি জানা যায়, যেমন সমকামিতা, শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। আমি একটি ক্যানসার সোসাইটি'র সাথে যুক্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে ২০২০ সালে সারা বিশ্বে ক্যানসার মহামারি হবে। আমি চাই বিজ্ঞানের সেফ, সিকিওর অ্যান্ড মিনিংফুল ইউজ হোক। আমাদের সংস্থায় একটা স্লোগান দেওয়া হয় – For no cancer know cancer. সমীক্ষণে এই বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চা আশা করব।

তৃতীয় বক্তা উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের প্রহ্লাদ পাল বলেন "বিজ্ঞান মনস্ক'কে এত সুন্দর পত্রিকা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা এখন হলঘরে সেমিনার করছি কিন্তু এই বিষয়গুলি জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমার বাড়ি কুচবিহারে। ওখানে শুনলাম একটা বটগাছ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে – এটা নিয়ে বিরাট এলাকায় কুসংস্কার ছড়াচ্ছে। তখন আপনাদের কথা মনে হল। পত্রিকাটা উপকারী। নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠতে পারিনি। ইসলামপুরে সমীক্ষণের প্রাপ্তিস্থান নেই, এটা দরকার। ওখানকার অনেকেই এর সাথে যুক্ত হতে চান। তাঁদের কাছে পৌঁছানোর আবেদন জানাই।

চতুর্থ বক্তা শিলিগুড়ির ছাত্র সৌরভ কর্মকার বলেন, "আমি সমীক্ষণ নিয়মিত পড়ি। কতগুলি পয়েন্ট ধরে আমার মতামত রাখছি। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে এটা ভাল। *পত্রিকা পুরোটা রঙিন হয়ত হবে না তবে ডায়াগ্রামগুলো অন্তত রঙিন হোক। *তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় কয়লাখনি নিয়ে রচনায় রুম অ্যান্ড পিলার পদ্ধতি এবং ব্লাস্ট মাইনিং পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো একটু বিস্তারিত জানালে ভাল হয়। *পত্রিকায় পাঠকদের আরও অংশগ্রহণের জন্য ক্যুইজ, শব্দজব্দ, খোলা বিতর্কের সুযোগ রাখা দরকার।"

পঞ্চম বক্তা শিলিগুড়ির কাজল কুমার রায় বলেন "এই পত্রিকার এবং অন্যান্য অনেক পত্রপত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আমি সমীক্ষণের প্রচারও করি। এই পত্রিকার গুণাগুণ এবং ত্রুটি নিয়ে আমার বক্তব্য আমি পেশ করছি। বর্ষ ৩, সংখ্যা ১/২-এর সম্পাদকীয়তে পত্রিকা তার পলিসি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে – বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার সুফলগুলি পাচ্ছে না এবং বিজ্ঞান আন্দোলনকে মূল সামাজিক আন্দোলনের অধীনে আনতে হবে। এই বক্তব্য সঠিক ও স্পষ্ট। ওই সংখ্যাতেই শততম বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে প্রাইভেটাইজেশন, বাণিজ্যকরণের প্রস্তাব এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য খোলসা করে দেওয়া হয়েছে জনগণের কাছে। বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩-এ হিগস বোসন নিয়ে যে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে

তা অসাধারণ। এখানে মূল রচনা আগে এবং ডঃ অমিতাভ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার পরে ছাপা হলে ভাল হত। রচনায় হিগস বোসন কণার আবিষ্কারের ইতিহাস নেই। এটা থাকার প্রয়োজন ছিল। ওই সংখ্যায় প্রকাশিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে রচনা খুব প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষ ১ এবং ২ সংখ্যায় প্রাণের উৎস সম্বন্ধে ভাববাদী মতবাদগুলি খন্ডন করা হয়েছে ধারাবাহিক জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে তা সঠিকভাবেই দেখানো হয়েছে তবে এবিষয়ে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়নি। আরও বিস্তারিতভাবে চর্চার প্রয়োজন ছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান ধারাবাহিক রচনাটি বিগত কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ হয়নি। এই রচনায় গ্রীক বিজ্ঞান এবং অ্যারিস্টটলের দর্শন ঠিকভাবে এসেছে তবে রোমান বিজ্ঞান ঠিকভাবে আসেনি। সাপ নিয়ে আতঙ্ক ও মুক্তি রচনায় সমস্যা থেকে উত্তরণের পরিষ্কার মতামত উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজু সরকারের সাক্ষাৎকার উপযুক্ত এবং যুগোপযোগী। এই বিষয় সমীক্ষণের রচনা অন্যান্য ম্যাগাজিনের চেয়ে উন্নত। পত্রিকায় জাতীয়-আন্তর্জাতিকস্তরের পুরানো এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়মিত প্রকাশ আরও দরকার। পরিবেশ দূষণ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় চালু মতামতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে সমীক্ষণ। এখানে সমীক্ষণের সবচেয়ে মৌলিক দিক যেটা সেটা হল পরিবেশকে গতিশীল হিসাবে বিবেচনা করা। পরিবেশের ভারসাম্য একটা গতিশীল ভারসাম্য এবং দূষণ করছে কর্পোরেট গ্রুপগুলি এই বক্তব্য মৌলিক। বর্জ্য বৈজ্ঞানিকভাবে নিষ্কাশন করতে হবে ব্যবস্থার মালিকদের এই দাবিও সঠিক। বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রধানত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা এই বিষয়টা অন্যান্য বিজ্ঞান পত্রিকা তুলে ধরছে না যা সমীক্ষণ করেছে। আমার মতে চিকিৎসা এবং অসুখ-বিসুখ নিয়ে চর্চা সমীক্ষণে হলেও তা যথেষ্ট নয়। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে সোর্সগুলিসহ বিজ্ঞানের খবর। কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমীক্ষণে আলোচনা পাইনি। এর প্রয়োজন আছে। সবশেষে বলি এই পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপন নেই। সাবান-ক্রিম ইত্যাদির বিজ্ঞাপন নাও নিতে পারি বিজ্ঞানের ভাল বই-এর বিজ্ঞাপন কেন দেব না?"

ষষ্ঠ বক্তা ছিল শিলিগুড়ির অল্পবয়সী ছাত্র আবেশ। সে বলে "আমি সমীক্ষণ নিয়ে কমই বলব। আমি সৌরভদার সাথে একমত। তবে একটা কথা বলতে চাই – প্রকৃতিকে বশ করার অদম্য স্পৃহা থেকে বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছেই বা কতটুকু আর নিয়েছেই বা কি তা বিচার করা দরকার। ২০১১ সালে সিকিমের ভূমিকম্পে যে ক্ষতি হল তার জন্য তো দায়ী স্থাপত্যবিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার না হওয়া। হিরোসিমার ঘটনা কি আমাদের অভিপ্রেত ছিল?"

পাঠকদের মতামতের পর সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে বলা হয় "যে চুলচেরা বিশ্লেষণ, সমালোচনা, প্রস্তাব ও মতামত এসেছে তা সমীক্ষণকে সমৃদ্ধ করবে। শুধু এরকম আলোচনা সভায় নয় চিঠিপত্র পাঠিয়ে নিয়মিত এটা জারী রাখুন, পত্রিকা পাঠক এবং জনসাধারণকে নিয়েই চলতে চায়। প্রদীপণবাবু এবং প্রহ্লাদবাবু যা বলতে চেয়েছেন বিজ্ঞান মনস্ক সেই মতেই চলতে চায়। তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত ও বিজ্ঞান সচেতন করা, অধিকার সচেতন করা, যে কোনও ঘটনার উৎসে গিয়ে তার স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। শুকনার ঘটনাটি জানতে পেরে আমরা টিম পাঠিয়েছিলাম এবং তার রিপোর্টও সমীক্ষণে ছাপিয়েছি। ইসলামপুরে পত্রিকা নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক গিয়ে উঠতে পারে নি। প্রহ্লাদবাবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা অবশ্যই সেখানে সমীক্ষণ নিয়মিত পাঠাব। সেখানকার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলার প্রয়াস নেব। সৌরভের প্রস্তাবগুলো অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কিন্তু সে ব্যাপারে তাকে এবং অন্য পাঠকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান রচনা, প্রাণের উৎস সন্ধান প্রসঙ্গে কাজলবাবু সমালোচনা আমর গ্রহণ করছি। বিজ্ঞানীদের জীবনী প্রকাশ এবং কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে রচনার প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য। তবে কৃষি বিজ্ঞান প্রসঙ্গে লিখতে গেলে শুধু বিজ্ঞানীদের মতামত নয়, যারা তা প্রয়োগ করছেন সেই কৃষকদের মধ্যে নিবিড় অনুসন্ধান প্রয়োজন। সমীক্ষণ বাজারী পত্রিকা নয়। কর্মী এবং পাঠকদের সহায়তায় চলে এই পত্রিকা। অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন নেওয়ার আমরা নীতিগতভাবে বিরোধী এই কারণে যে তবে অর্থদাতা সংস্থার শর্ত আমাদের কম-বেশী মেনে চলতে হবে। শুধু ভাল বই কেন, বিজ্ঞানের যে কোন রচনা যা মানব সমাজ বিকাশের পক্ষে তা আমরা প্রচার করি এবং করতে চাই। সমীক্ষণের লেখকরা কেউ তথাকথিত বিজ্ঞানী নন। এই পত্রিকায় যা লেখা হয় তা দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের কর্মকান্ড। ছোট্ট বন্ধু আবেশ যা বলেছে তা নিয়ে আমাদের সকলের ভাবা প্রয়োজন।"

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

শিলিগুড়ির আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তারা, ৩০শে মার্চ ২০১৪

এরপর পাঠক গৌতম চক্রবর্তী তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং আমাদের এক কর্মী আবৃত্তি করেন।

এরপর শুরু হয় সেমিনার "পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার কি মানব প্রগতির অন্তরায়" শীর্ষক সেমিনার। স্লাইড শো-এর মাধ্যমে আমাদের ৩ জন কর্মী তা পেশ করেন। খুব মনোগ্রাহী না হলেও সমীক্ষণে গত সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনায় যা আছে তা নানা দিক আলোচনায় উঠে আসে। এই সেমিনারের পর একজন পাঠক প্রশ্ন রাখেন সুরক্ষার প্রশ্নটি বিচার করে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করলে আধুনিক সমাজের অগ্রগতি কিভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের বা মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে আলোচকরা মানব প্রগতি প্রশ্নে বিজ্ঞান মনস্কের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন। ■

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চট্টা অঞ্চলে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান

গত ১৫ই এপ্রিল বা ১লা বৈশাখে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা থানা এলাকার চট্টা অঞ্চলের একটি স্কুলে গণসচেতনতামূলক একটি প্রদর্শনী করা হয়। বিজ্ঞানের খেলা দেখানোর মাধ্যমে কুসংস্কারের উৎসগুলি অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। ■

১লা মে-তে বিজ্ঞান মনস্ক

গতবারের মত এবছরও লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়ন (সমন্বয় সমিতি)-র ডাকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের মিছিল এবং জমায়েতে আমাদের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের একটি সভা গৃহে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমাদের প্রতিনিধি বিজ্ঞান মনস্ক কেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে শ্রমিকশ্রেণীর আওয়াজের পাশে তা ব্যাখ্যা করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যা কিছু আবিষ্কার এবং মানব সমাজে ব্যবহার – তার সবই করছে মজুরীভোগী শ্রমিকরা। এই সমাজে বিজ্ঞানীরাও মজুরীভোগী মানুষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল প্রকৃত অর্থে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হতে গেলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসানই কাম্য। মে দিবসের আওয়াজে তাই বিজ্ঞান মনস্ক-ও সামিল।

এই পর্যায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, মতামত ও পত্রিকা নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস জারী রয়েছে। দুটি নতুন জেলার অল্প কিছু বন্ধু আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com